নিতাই দাস

বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন
সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন
সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

নিতাই দাস

বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন : সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
BANGLADESH STUDENTS UNION :
SHORT HISTORY—BY-NITAI DAS

প্রথম প্রকাশ
৪ঠা কার্তিক ১৩৯১
২১শে অক্টোবর ১৯৮৪

প্রকাশক : দিলওয়ার হোসেন
রঞ্জন কর্মকার

প্রচ্ছদ : কাজী হাসান হাবিব

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : স্বপন বিশ্বাস, ডাঃ মাহবুব
সাকিনা বানু সাকী
মৌসুমী দাশ পুরকায়স্থ

মুদ্রক :
প্যাপিরাস প্রেস
১৫৯, আরামবাগ, ঢাকা-২

মূল্য : সাত টাকা

স্বাধীনতা সংগ্রাম
সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন
ও জনগণের অধিকার
আদায়ের লড়াইয়ে
বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের
অমর শহীদ নিজামউদ্দীন আজাদ,
সিরাজুম মুণীর, মির্জা কাদের,
মতিউল ইসলাম, তাজুল ইসলাম,
শাহাদাত হোসেন প্রমুখের
বিপ্লবী স্মৃতিতে নিবেদিত।

এক

যাত্রা হলো শুরু

১৯৫২ সাল। আমাদের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ কাল। ৪ বছর আগে ১৯৪৮ সালে প্রথম ভাষা আন্দোলনের যে বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল ছাত্র যুবকদের মনে এই সময়ে তা মহীরুহের আকার ধারণ করতে সক্ষম হয়। শহর বন্দর গ্রাম, স্কুল কলেজ, হাট বাজার—সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়ে আন্দোলন—'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'। গোটা পূর্ব বাংলা নাড়া খায়, নাড়া খায় গোটা দেশের মানুষ। এর ফলে বাংলা ভাষাভাষী মানুষের চেতনায় আসে পরিবর্তন। যাত্রা শুরু হয় নতুন পথে।

'মুসলমানদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র' এই বক্তব্যের ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পুঁজিবাদ, সামন্তবাদের প্রতিভূ সাম্রাজ্যবাদের তাবেদার মুসলিম লীগের শাসন কায়েম হয় হাজার মাইল ব্যবধানে অবস্থিত দুই ভূখণ্ডের দেশ—পাকিস্তানে। নতুন দেশে গণতন্ত্রহীন পরিবেশে বামপন্থীদের পীড়ন ছাড়াও মুসলিম লীগ শাসকরা জাতিগত নিপীড়নের পথ অনুসরণ করতে থাকে। পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীকে অধিকার থেকে বঞ্চিত করার প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে আঘাত হানা হয় ভাষার উপর। ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বরের প্রথম দিকে পাকিস্তানের প্রথম শিক্ষা সম্মেলনে উর্দুকে সরকারী ও শিক্ষার ভাষা করার প্রস্তাবের প্রতিবাদে ৬ই ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিবাদ সভার মধ্য দিয়ে ভাষা আন্দোলনের কার্যত সূত্রপাত হয়। পরের বছর ভাষার প্রশ্নে পূর্ব বাংলায় তীব্র আন্দোলন গড়ে উঠে। ফেব্রুয়ারী-মার্চে কয়েকদফা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ধর্মঘট, সাধারণ ধর্মঘট পালন, সেক্রেটারিয়েট-এসেম্বলি ঘেরাও, গ্রেফতার-নির্যাতনের পর ১৫ই মার্চ পূর্ব বাংলার প্রধান মন্ত্রী খাজা নাজিম উদ্দিন প্রদেশের সরকারী ভাষা হিসেবে বাংলাকে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হন। ছাত্র আন্দোলনের এই প্রাথমিক বিজয়ের পরও জিন্নাহ সাহেব রেসকোর্স ও কার্জন হলে উর্দুরই স্বপক্ষে বক্তব্য হাজির করেন। ফলে আন্দোলন না থেমে সামনে

অগ্রসর হতে থাকে। এ কথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, আন্দোলন করেই দাবী আদায় করতে হবে।

এই সময়ে মুসলিম লীগের একচ্ছত্র আধিপত্যে কিছু ফাটল ধরে। পূর্ব বাংলায় সরকার সমর্থক নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগ ভেঙ্গে নইমুদ্দিন আহমদ, আবদুর রহমান চৌধুরী, শেখ মুজিবুর রহমান প্রমুখের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগ গঠিত হয় (৪ঠা জানুয়ারী, ১৯৪৮)। ১৯৪৯ সনের ৯ই মার্চ মুসলিম লীগের একাংশ মাওলানা ভাসানী, শামসুল হক প্রমুখের নেতৃত্বে গঠন করেন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ। মুসলিম লীগের শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত কমিউনিস্ট পার্টি, ছাত্র ফেডারেশন, ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন প্রভৃতি বামপন্থী সংগঠনের সংগ্রামের কাফেলা আর একা থাকল না।

ভাষা আন্দোলনের প্রশস্ততর পর্যায় শুরু হয় ১৯৫২ সালে। ২৬শে জানুয়ারী পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী খাজা নাজিম উদ্দিন মুসলিম লীগ সম্মেলনে উর্দু রাষ্ট্রভাষা হবে বলে ঘোষণা করেন। এ বক্তব্যের প্রতিবাদে গর্জে উঠে ছাত্র-জনতা। সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়—সভা, সমাবেশ, ধর্মঘট শুরু হয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। ৪ঠা ফেব্রুয়ারী হয় প্রথম হরতাল। ২১শে ফেব্রুয়ারী ঘোষিত হয় 'রাষ্ট্রভাষা দিবস'। ২০ তারিখ সরকার জারী করে ১৪৪ ধারা। সংগ্রাম পরিষদের সিদ্ধান্ত অমান্য করে ছাত্ররা ৪ জন করে রাস্তায় বের হয় ও গ্রেপ্তার বরণ করতে থাকে। পরবর্তীতে ছাত্রদের উপর চলে গুলি। শহীদের রক্তের ঋণ শোধ করতে এগিয়ে আসে লাখ লাখ মানুষ। পরপর তিনদিন চলে ধর্মঘট-হরতাল। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষিত হলেও আন্দোলন থামে না—ছড়িয়ে পড়ে সারা দেশে। গ্রেপ্তার হয় শত শত, তবুও আন্দোলন থামেনা—এগিয়ে আসে নতুন নতুন মুখ। ভাষার প্রশ্নে জেগে উঠে গোটা পূর্ব বাংলা—মুসলিম লীগ বিচ্ছিন্ন হয় বাংলা থেকে।

ছাত্র ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা

২১শে ফেব্রুয়ারীর পর ভাষা আন্দোলনের সাথে জড়িত শত শত রাজনৈতিক কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়। সারা দেশে প্রচুর ছাত্রকেও

আটক করা হয়। অনেকের নামে জারী করা হয় হুলিয়া। গোটা পূর্ব বাংলা জুড়ে কায়েম হয় ত্রাসের রাজত্ব। এই অবস্থায় এপ্রিলের শেষভাগে ঢাকা শহরে সারা দেশের অগ্রেপ্তারকৃত ছাত্র নেতাদের এক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। ভাষা আন্দোলন পরিচালনার সমস্যা-সংকট ইত্যাদি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর কনভেনশনে উপস্থিত সকলে একমত হলেন, আন্দোলন এগিয়ে নিয়েই ভাষার দাবী আদায় করতে হবে। বাংলা ভাষা কোন সম্প্রদায় বিশেষের নয়—তাই হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রীষ্টান নির্বিশেষে সকল বাঙালীকে ঐক্যবদ্ধ করে সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে উঠেই এ দাবীর বাস্তবায়ন করতে হবে। কিন্তু তখন পর্যন্ত ছাত্রদের কোন অসাম্প্রদায়িক সংগঠন ছিলনা। আন্দোলন পরিচালনার অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে মুসলিম ছাত্র লীগ ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার প্রশ্নে দোদুল্যমানতা ও দৃঢ় চিত্তের অভাব প্রদর্শন করেছে। ভবিষ্যতে আন্দোলনকে জোরদার করতে হলে তাই একটি দৃঢ় ও বলিষ্ঠ ধরনের সংগঠন প্রয়োজন—যার অন্যতম মূলনীতি হবে অসাম্প্রদায়িকতা।

২৬শে এপ্রিল ঢাকার বার লাইব্রেরী হলে গঠিত হল নতুন ছাত্র সংগঠন। পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন নামের এই ছাত্র সংগঠনটিই আজকের বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন। ছাত্র নেতা কাজী আনোয়ারুল আজীম ও সৈয়দ আবদুস সাত্তার হলেন যুগ্ম আহবায়ক।

জন্মের সময়ে এই সংগঠনের মূল বক্তব্য ছিল ঃ

অসাম্প্রদায়িকতা ঃ ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে অসাম্প্রদায়িক চেতনার ভিত্তিতে জাতিগতভাবে এক হয়ে সকল ছাত্রছাত্রীকে জমায়েত করা।

দৃঢ় ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ঃ আন্দোলন-সংগ্রামে আপোসহীন দৃঢ়তা নিয়েই সংগঠনকে অগ্রসর হতে হবে।

সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা ঃ পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল লীগ সরকারকে সমর্থন দিচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো। তাই ছাত্র-জনতার সংগ্রাম সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেও পরিচালিত হবে। ভাষা সহ মানুষের বিভিন্ন

অধিকারের অন্যতম শত্রু হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ। তাই, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম বিশেষ জরুরী।

জাতীয় অধিকার প্রতিষ্ঠা: ভাষার উপর আক্রমণ প্রকৃতপক্ষে জাতীয় অধিকারের উপরই আক্রমণ। তাই আন্দোলন শুধু ভাষার দাবীতেই সীমিত রাখা চলবে না—জাতীয় অধিকার প্রতিষ্ঠা তথা পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনের আন্দোলনের দিকেও এ সংগ্রামকে নিয়ে যেতে হবে।

গণতন্ত্র: পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে গণতন্ত্রহীন পরিবেশ কায়েম করা হয়। মুসলীম লীগের একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এর পরিবর্তনের জন্য ছাত্র ইউনিয়ন দাবী করে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা।

ছাত্র গণ-সংগঠন: এ পর্যন্ত গঠিত বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনগুলো কোন না কোন রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত। তাই রাজনৈতিক দলাদলি বা মতাদর্শের উর্দ্ধে উঠে প্রকৃত ছাত্র গণজমায়েত গড়ে উঠছেনা। ছাত্র সমাজকে আন্দোলনে সামিল করতে হলে রাজনৈতিক দলাদলির উর্দ্ধে থেকে একটি সংগঠনের পতাকাতলে জমায়েত করতে হবে। এই ধরনের সংগঠন হিসেবে ছাত্র ইউনিয়ন গড়ে উঠুক—এই ছিল তখনকার ছাত্র নেতৃত্বের ইচ্ছা।

ভাষা আন্দোলনের ফলে ছাত্র সমাজের মধ্যে যে নতুন চেতনার সঞ্চার হয়েছিল তাকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য যে ধরনের সংগঠন প্রয়োজন সে ধরনের সংগঠনের চাহিদা পূরণ করতে প্রয়াসী হলো ছাত্র ইউনিয়ন। আন্দোলনের সময় যে ব্যাপক সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী সমবেত হয়েছিল, তারাও বাস্তবতার প্রতিধ্বনি শুনতে পেলো ছাত্র ইউনিয়নের মধ্যে। তাই দেখা গেল জন্মের অব্যবহিত পরেই ঢাকা সহ বিভিন্ন জেলায় ছাত্ররা দলে দলে আসতে থাকে এই সংগঠনে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম পরিষদ, বিভিন্ন হল সংসদের নেতৃবৃন্দ যোগ দিলেন ছাত্র ইউনিয়নে। মুসলিম ছাত্র লীগের অনেক নেতা ও কর্মীও এসে জড়ো হলেন। জেলখানা থেকে অনেক ছাত্র

নেতা একাত্মতা ঘোষণা করে বার্তা পাঠালেন। এভাবে জন্মলগ্নেই ছাত্র ইউনিয়ন ছাত্র সমাজের নিজস্ব সংগঠনে পরিণত হয়।

ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা থেকে যে সংগঠনের জন্ম, তা স্বাভাবিক ভাবেই প্রতিক্রিয়াশীল সরকারের কোপ দৃষ্টিতে পতিত হয়। ছাত্র ফেডারেশনের মতোই ছাত্র ইউনিয়নকে বিভিন্ন অপ প্রচারের শিকার হতে হয়। 'ছাত্র ইউনিয়ন কমিউনিস্টদের সংগঠন—কমিউনিস্টরা দেশের শত্রু', 'ছাত্র ইউনিয়ন ধর্মহীন'—ইত্যাদি অপপ্রচার সত্ত্বেও ছাত্র ইউনিয়নের প্রসার রোধ হয়নি—ছাত্র ইউনিয়ন এগিয়ে যায় পাল তোলা নৌকার মতো উদ্দাম গতিতে আপন লক্ষ্যের অভিমুখে।

প্রথম সম্মেলন

১৯৫২ সালের ডিসেম্বর মাসে ছাত্র ইউনিয়নের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। জন্মের পর ৮ মাসে তীব্র দমননীতির মধ্যেও ঢাকা সহ বিভিন্ন জেলায় সংগঠনের বিস্তৃতি ঘটে। এই সম্মেলনে সংগঠনের নাম কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করে রাখা হয় পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন। পাকিস্তানের দুই অংশের মানুষের চেতনার মান একরকম না, দুই অঞ্চলের অর্থনীতি, সমাজব্যবস্থা, সংস্কৃতি-ঐতিহ্য ইত্যাদি সবই আলাদা—তাই দুই স্থানের আন্দোলনও সমভাবে অগ্রসর হতে পারেনা। এ কারণে পাকিস্তানভিত্তিক আন্দোলন ও সংগঠন গড়ে তোলা কঠিন। এদিক বিবেচনা করে সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিরা পূর্ব পাকিস্তান ভিত্তিক সংগঠন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সম্মেলনে সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করা হয়। মোহাম্মদ সুলতানকে সভাপতি এবং মোহাম্মদ ইলিয়াসকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচন করে নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয়।

একুশে উদযাপন

একুশে ফেব্রুয়ারীর প্রথম বর্ষপূর্তিকে সামনে রেখে ছাত্র ইউনিয়ন শহীদের পুণ্য স্মৃতিতে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদনের কর্মসূচী গ্রহণ করে। মেডিক্যালের সামনে শহীদের রক্তরঞ্জিত স্থানে শহীদ মিনার গড়ে উঠল। কিন্তু মুসলিম

লীগ সরকারের পেটোয়া বাহিনী তা ভেঙ্গে ফেলে। আবার গড়া হলো—আবার ভেঙ্গে ফেলা হলো। এভাবে ভাঙ্গা গড়ার মধ্য দিয়েই উদ্‌যাপিত হয় প্রথম একুশে। কালের পথ বেয়ে আজ সেই একুশে পরিণত হয়েছে জাতীয় শোক দিবসে। সংকলন প্রকাশ, প্রভাতফেরী করার ঐতিহ্য সৃষ্টির শুরু সেই থেকে। ছাত্র সমাজকে সংগঠিত করার পাশাপাশি একুশের সংগ্রামী আবেদনকে ধরে রাখার কাজেও ছাত্র ইউনিয়ন পালন করেছে অগ্রণী ভূমিকা।

আন্দোলন-নির্বাচন

ভাষা আন্দোলনের সময় যে সব রাজনৈতিক নেতা ও ছাত্র সহ বিভিন্ন মহলের মানুষ গ্রেপ্তার হয়েছিলেন তাদেরকে মুক্ত করার জন্য ছাত্র ইউনিয়ন আন্দোলন শুরু করে। আন্দোলনের চাপে শেষ পর্যন্ত সরকার বন্দীদের ছাড়তে বাধ্য হয়।

বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার পূর্বতন সংগ্রামকে অব্যাহত রাখার জন্যও এই সময়ে প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়। ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যে সব সাফল্য অর্জিত হয়েছে তা বিকশিত করার লক্ষ্যে সাম্প্রদায়িকতা, সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদ, সামন্তবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গণতন্ত্র, শায়ত্ত-শাসন ও প্রগতিশীল মতাদর্শ প্রতিষ্ঠা করার জন্য ছাত্র ইউনিয়ন প্রথম থেকেই প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। ছাত্রদের শিক্ষার ব্যয়ভার হ্রাস সহ জনগণের কল্যাণমুখী শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও জনগণের গণতান্ত্রিক মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ছাত্র ইউনিয়ন সংগ্রাম চালায়। ছাত্র ইউনিয়নের বক্তব্য ছাত্র সমাজের কাছে অধিকতর গ্রহণীয় হয়ে উঠতে থাকে। এর প্রভাব পড়ে অন্যান্য ছাত্র সংগঠন বিশেষত মুসলিম ছাত্র লীগের মধ্যে। ১৯৫৪ সালের প্রথম দিকে ছাত্র লীগ অসাম্প্রদায়িক সংগঠনে পরিণত হয়।

এই সময়ে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র সংসদের নির্বাচন হয়। অবাক হওয়ার মতো ব্যাপার মনে হলেও সত্য যে, এক থেকে দেড় বছরের একটি সংগঠন—ছাত্র ইউনিয়ন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জয়লাভ করে। ছাত্র ইউনিয়ন নিছক নির্বাচনের জন্যই নির্বাচন করেনা—

আন্দোলনের অংশ হিসেবেই নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে থাকে। তাই এই জয় আন্দোলনেরই জয় বলে বিবেচিত হয়েছিল।

এক সংগঠনের প্রয়াস ও দ্বিতীয় সম্মেলন

দলীয় মতাদর্শের উর্দ্ধে উঠে অসাম্প্রদায়িক চেতনা নিয়ে ছাত্র জনতার অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ছাত্রদের মধ্যে একটি সংগঠন গড়ে উঠুক—এই ছিল ছাত্র ইউনিয়নের ঘোষিত নীতি। এই নীতি বাস্তবায়নের জন্য ছাত্র ইউনিয়ন উদ্যোগ গ্রহণ করে। ছাত্র লীগের সাথে আলাপ আলোচনার পর ঠিক হয় যে ১৯৫৪ সালের জানুয়ারী মাসের ১৪, ১৫ তারিখে উভয় সংগঠনের সম্মেলন হবে এবং ১৬ তারিখ উভয় সংগঠনের যুক্ত সম্মেলন হবে এক সংগঠন করার জন্য।

ঐ সময়ের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও ছাত্র আন্দোলন গড়ে উঠে। শুধুমাত্র সামন্ত প্রভু ও শিল্পপতিদের সন্তানদের জন্যই উচ্চ শিক্ষা নয়—সকলের শিক্ষার সুযোগ প্রসার ও ব্যয় হ্রাসের দাবীতে সেখানে ছাত্র আন্দোলন বেশ অগ্রসর হয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তানে ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্র লীগের ঐক্য আলোচনা চলার সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানের ছাত্র আন্দোলনের নেতাদের মধ্যে বিশেষ উৎসাহের সৃষ্টি হয়। পাকিস্তান ভিত্তিক একটি ছাত্র সংগঠন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে করাচীর 'দাও মেডিক্যাল কলেজের' ছাত্র জনাব সারোয়ার ঢাকায় আসেন এবং ছাত্র ইউনিয়নের নেতৃত্বের সাথে আলোচনা করেন।

সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১৪, ১৫ই জানুয়ারী ছাত্র ইউনিয়নের দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় র‍্যাংকিন ষ্ট্রীটের একটি বাড়ীর প্রাঙ্গনে। সম্মেলনে নতুন সভাপতি হন আবদুল মতিন এবং সাধারণ সম্পাদক হন গোলাম আরিফ টিপু। ঐক্যের প্রস্তাব ছাত্র ইউনিয়ন সম্মেলনে গৃহীত হয়। কিন্তু ছাত্র লীগ তখনই ঐক্যবদ্ধ হতে রাজী হয় না। প্রাদেশিক নির্বাচনের পর ঐক্যের কাজ শুরু করার জন্য আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের একাংশ ছাত্র লীগকে পরামর্শ দেয়। তখন ঠিক হয় যে নির্বাচনের পর মে মাসে যৌথ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। দুই সংগঠন থেকে ৪ জন করে ৮ জন ও সারোয়ারকে নিয়ে গঠিত

একটি আহ্বায়ক কমিটির উপর সম্মেলন আহ্বানের দায়িত্ব দেয়া হয়। অবশ্য পরবর্তীতে আর এ প্রক্রিয়া অগ্রসর হয়নি।

যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন ও ছাত্র ইউনিয়ন

১৯৫০, '৫১ সালে পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশে প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন হয় ১৯৫৪ সালে। গণ-ধিকৃত মুসলিম লীগের রাজনীতিকে নির্বাচনে পরাভূত করে ভাষা আন্দোলনের ধারায় নতুন পথ রচনা করার লক্ষ্যে ছাত্র ইউ-নিয়ন প্রথম থেকেই ঐক্যের আওয়াজ উত্থাপন করে। পূর্ব বাংলার মূল দুই দল সোহরাওয়ার্দী-ভাসানীর আওয়ামী লীগ ও শেরে বাংলার কৃষক প্রজা পার্টি সহ মুসলিম লীগ বিরোধী অন্যান্য দলের ঐক্যবদ্ধ প্ল্যাট-ফরমের দাবী অবশ্য সে সময়ে কমিউনিস্ট পার্টিও উত্থাপন করে।

'হক-ভাসানী-সোহরাওয়ার্দী এক হও' এই শ্লোগান উত্থাপন করে ছাত্র ইউনিয়ন কর্মীরা নির্বাচনী ঐক্য গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করতে অগ্রসর হয়। অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী কৃষক প্রজা পার্টির নেতা শেরে বাংলা ফজলুল হক প্রথমদিকে ঐক্যের ব্যাপারে অনীহা দেখান। ছাত্র ইউনিয়ন কর্মীরা তাঁকে ঘেরাও করে। শেষ পর্যন্ত তিনি ঐক্যের প্রস্তাব গ্রহন করেন। আওয়ামী লীগও বিশেষ কাউন্সিল অধিবেশনে ঐক্যের পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। শেষ পর্যন্ত ডিসেম্বরে আওয়ামী লীগ, কৃষক প্রজা পার্টি, গণতন্ত্রী দল, নেজামে ইসলাম ও খেলাফতে রব্বানী পার্টিকে নিয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। স্বায়ত্বশাসন, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করা, পূর্ব বাংলাকে শিল্পায়িত করা, ২১শে ফেব্রুয়ারীকে শহীদ দিবস হিসেবে ঘোষণা ইত্যাদি দাবী সহ ২১ দফা দাবী কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়।

ছাত্র ইউনিয়নের ২য় সম্মেলনের পর থেকে ছাত্র ইউনিয়ন কর্মীরা গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে পড়ে। যুক্তফ্রন্টের পক্ষে বিশাল গণ জমায়েত গড়ে উঠে। ফলশ্রুতিতে ৯টি আসন ছাড়া বাকি ২২৮ আসন লাভ করে যুক্তফ্রন্ট। অমুসলিমদের আসন থেকে ৪টি আসন পায় কমিউনিস্ট পার্টি। শেরে বাংলা হন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু কেন্দ্রীয় ষড়যন্ত্রের শিকারে পরিণত হয়ে

২ মাসের মধ্যে ৯২ ক ধারা বলে যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রীসভা বাতিল হয়ে যায়। কায়েম হয় গভর্নরের শাসন।

ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে ছাত্র ইউনিয়ন

পূর্ব বাংলায় মুসলিম লীগ বিরোধী গণ-জোয়ারে ভীত হয়ে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিল করেই ক্ষান্ত হলো না—অত্যাচার নিপীড়নের নির্মম পথ ধরে অগ্রসর হতে থাকল। ইসকান্দার মীর্জা গভর্ণর হয়ে এসে সংবাদপত্রের উপর সেন্সরশীপ চালু করেন। শেখ মুজিব সহ ৩৫ জন পরিষদ সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়। হক সাহেব হন গৃহবন্দী। সহস্রাধিক যুক্তফ্রন্ট কর্মীকে ঢোকানো হয় জেলে। কমিউনিস্ট পার্টি হয়ে যায় বেআইনী। গ্রেফতার করা হয় কমিউনিস্টদের। ছাত্র ইউনিয়নেরও কেন্দ্র, জেলা, থানা পর্যায়ের কর্মীদের গ্রেপ্তার করা হয়। সারা প্রদেশ জুড়ে চলে কেন্দ্রীয় শাসনের এক তাণ্ডব লীলা।

বজ্র আটুনীর সেই কঠিন দিনগুলোতে ছাত্র ইউনিয়নের অগ্রেপ্তারকৃত নেতা ও কর্মীরা গোপনে কাজকর্ম পরিচালনা করতে প্রয়াসী হন। সাংগঠনিক যোগাযোগ রক্ষা করে সংগঠনকে পরবর্তী করণীয়গুলো সম্পাদনের জন্য প্রস্তুত করতে প্রচেষ্টা চালানো হয়। এর মধ্যেই চলে আসে '৫৫ সালের একুশে। এই একুশেকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানী স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করে ছাত্র ইউনিয়ন। তৎকালীন ছাত্র আন্দোলন বিশেষত সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের বিশিষ্ট কর্মী জহির রায়হানের তত্ত্বাবধানে বিরাট প্রভাতফেরী বের হয়। সেই প্রভাতফেরীতে স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে তুমুল প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়। প্রভাতফেরীতে পুলিশ হামলা করে ও ১৫০ জন ছাত্রী সহ বহু সংখ্যক ছাত্রকে গ্রেপ্তার করা হয়।

যুক্তফ্রন্টের ঐক্য বিনষ্ট করতে প্রয়াসী হয় পাকিস্তানের অধিপতিরা। গভর্ণর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ খাতিরের ভান করলেন আওয়ামী লীগের সাথে। অপর দিকে প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী টোপ দিলেন হক সাহেবকে। ১৯৫৪ সালের ২০শে ডিসেম্বর জনাব সোহরাওয়ার্দী কেন্দ্রের

আইনমন্ত্রী হলেন। কেন্দ্রের কারসাজিতে যুক্তফ্রন্টের নামে আওয়ামী লীগকে বাদ দিয়ে কৃষক প্রজা পার্টির আবু হোসেন সরকার মুখ্যমন্ত্রী হয়ে গেলেন '৫৫ সালের ৫ই জুন। শেরে বাংলা হয়ে যান কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। পরবর্তীতে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর হন। ১৯৫৬ সালে আবু হোসেন সরকার মন্ত্রী সভার পতন হলে ৬ই সেপ্টেম্বর আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ মন্ত্রী সভা গঠিত হয়। কেন্দ্রেও ইসকান্দার মীর্জার সহায়তায় জনাব সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে মন্ত্রী সভা গঠন করা হয়েছিল। এভাবেই যুক্তফ্রন্ট আর যুক্ত না থেকে ভঙ্গুর পথে পতিত হয়। এই ডামাডোলের মধ্যে ছাত্রলীগ আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের অন্ধ অনুসারী হয়ে থাকে। একমাত্র ছাত্র ইউনিয়নই আওয়াজ তোলে 'যুক্তফ্রন্টের ঐক্য রক্ষা করতে হবে'। এ প্রচেষ্টা ফলপ্রসু না হলেও ঐক্যের পতাকাধারী ছাত্র ইউনিয়নের সম্মান যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়।

১৯৫৫ সালে দ্বিতীয় গণপরিষদ গঠনের সময় সংখ্যা সাম্যনীতি গ্রহণ করে পূর্ব পাকিস্তান থেকে ৪০ জন ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ৪০ জন সদস্য নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। পূর্বে এরকম ব্যবস্থা ছিল না। এই নতুন ব্যবস্থা কায়েমের পিছনে আওয়ামী লীগ তথা সোহরাওয়ার্দী সাহেবেরও সায় ছিল। ছাত্র ইউনিয়ন এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ করে এবং জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্বের দাবী উত্থাপন করে। অবশ্য পরবর্তীকালে উল্লিখিত দাবী এদেশের সব মানুষের দাবীতে পরিণত হয়। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধানেও সংখ্যা-সাম্যনীতি বহাল থাকে, যুক্তফ্রন্টের ২১ দফায় বর্ণিত স্বায়ত্বশাসনের দাবীসহ বিভিন্ন দাবীরও কোন ফয়সালা হলো না। ছাত্র ইউনিয়ন এই অন্যায় ব্যবস্থা কখনো মেনে নেয় নি—শক্তি সামর্থ অনুযায়ী প্রতিবাদ প্রতিরোধ করেই চলল।

তৃতীয় সম্মেলন

১৯৫৬ সালে ছাত্র ইউনিয়নের তৃতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আওয়ামী লীগ অনুসৃত কেন্দ্র ও প্রাদেশিক সরকারের নীতিসমূহ নিয়ে তখন স্বাভাবিক

কারণেই জনমনে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। বিশেষত সংখ্যা সাম্যনীতি, বিদেশনীতি, স্বায়ত্বশাসন, অর্থনীতি ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে এবং বাইরেও তখন বিতর্ক চলছিল। ছাত্র লীগের অন্ধ আওয়ামী লীগ সমর্থনের কারণে উল্লিখিত প্রশ্নেও কোন বক্তব্য উত্থাপন করতে ব্যর্থ হয়। সঙ্গত কারণেই ছাত্র লীগের সাথে ছাত্র ইউনিয়নের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। অনুরূপ দ্বন্দ্ব আওয়ামী লীগ সরকারের সাথেও সৃষ্টি হয়। এই পটভুমিতে ন্যায়ের সংগ্রামে অটল থাকার ছাত্র ইউনিয়নের বরাবরের যে নীতি সে নীতিতে চলার শপথ নিয়েই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে আবদুস সাত্তার সভাপতি ও এস, এ, বারী এ, টি, সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

১৯৫৭ সনের ৪—৭ই জানুয়ারী রংপুর শহরে সারা দেশের ছাত্র যুবকদের যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই দেশে এই ধরনের উৎসব এই প্রথম। যুব লীগ এই উৎসবের মূল উদ্যোক্তা হলেও ছাত্র ইউনিয়ন এই উৎসবের কাজে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে।

আওয়ামী লীগে ভাঙ্গন

কেন্দ্রে সোহরাওয়ার্দী ও প্রদেশে আতাউর রহমান খানের সরকার অনুসৃত নীতি সমুহকে কেন্দ্র করে যে বিতর্ক সৃষ্টি হয় দলের অভ্যন্তরে তার ফল হিসেবে আওয়ামী লীগ ভাগ হয়ে যায়। ১৯৫৭ সনের ৭—৮ই ফেব্রুয়ারী আওয়ামী লীগের কাগমারী সম্মেলনেই পাকমাকিন সামরিক চুক্তি, বাগদাদ চুক্তিকে কেন্দ্র করে তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি হয়। সোহরাওয়ার্দী অনুসৃত পররাষ্ট্র নীতি নিয়ে এই বিতর্ককে কেন্দ্র করে সমগ্র আওয়ামী লীগ দুই অংশে বিভক্ত হয়ে পড়ে। পুর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সভাপতি মাওলানা ভাসানী, পশ্চিম পাকিস্তানের গাফফার খান, পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুল হক ওসমানী প্রমুখের নেতৃত্বে ন্যাপ গঠিত হয় ২৫, ২৬ জুলাই। গণতন্ত্রী দলও এতে সামিল হয়।

ষড়যন্ত্রের পরিণতি : সামরিক আইন

১৯৫৮ সালে পূর্ব পাকিস্তানে বারবার সরকার পরিবর্তন ঘটতে থাকে। পরিস্থিতি অস্থিতিশীলতার পর্যায়ে নেমে আসে। যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে যে আশা আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি হয়েছিল জনমনে তার অবশেষ আর থাকে না। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের আপোসকামী সুবিধাবাদী, দোদুল্যমান চরিত্র বিশেষ প্রকট হয়ে উঠে। রাজনীতি জনগণের কাতারে না থেকে টেবিল পলিটিক্সে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। কেন্দ্রীয় প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের ফলশ্রুতিতে সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপের পায়তারা চলতে থাকে। সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ ও প্রভাব বৃদ্ধি পায় বহুলাংশে।

'৫৬ সালের সংবিধান মোতাবেক '৫৯ সালের অনুষ্ঠেয় নির্বাচনের প্রাক্কালে রাজনৈতিক সমাবেশ হলে হয়তো জটিলতা কিছুটা কাটতে পারতো —কিন্তু তার আগেই হয়ে যায় শ্বাসরুদ্ধকর নাটকের অভিনয়।

১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর ইস্কান্দার মীর্জা সামরিক আইন জারী করে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ ও মন্ত্রী সভা বাতিল করেন। সংবিধান স্থগিত করে আইয়ুবকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিয়োগ করা হয়। শেষ পর্যন্ত ইস্কান্দার মীর্জাও বিতারিত হন। ২৭শে অক্টোবর আইয়ুব হন সমগ্র ক্ষমতার অধীশ্বর।

সামরিক আইন জারীর পূর্বেই ছাত্র ইউনিয়নের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন শাহ আজীজ আক্কাস ও সাধারণ সম্পাদক সাদ উদ্দিন। অবশ্য ঘটনার ক্রমপরিণতিতে এই কমিটি বিশেষ কাজ করতে সক্ষম হয়নি।

দুই

রুদ্ধ দ্বারে সফল আঘাত

আইয়ুবের ক্ষমতা দখল হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদের ইচ্ছানুসারে। পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি, বাগদাদ চুক্তি ইত্যাদি সহ পাকিস্তানে সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থকে পাকাপোক্ত রূপ দেয়ার তাগিদে একটা পোক্ত সরকার দরকার—সেদিক থেকে মার্শাল ল-ই উৎকৃষ্ট পথ। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আশীর্বাদ নিয়ে আইয়ুব ক্ষমতায় এসেই সাম্রাজ্যবাদের উপর নির্ভরশীল পুঁজিবাদী অর্থনীতি কায়েমে তৎপর হন। তার জন্য গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নস্যাৎ করে জাতিগত নিপীড়নের নগ্ন পথে যাত্রা করলেন তিনি। রাজনীতি বন্ধ করা হলো। গ্রেপ্তার হলো শত সহস্র রাজনৈতিক নেতা ও কর্মী। ছাত্র সংগঠনগুলোর কাজও বেআইনী করা হয়। ছাত্র ইউনিয়নও স্বাভাবিক কারণেই প্রকাশ্য কাজের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়।

অন্য ছাত্র সংগঠন নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকলেও ছাত্র ইউনিয়ন হাল ছেড়ে দিল না। কাজের ধরণ একটু পরিবর্তন করে নিল মাত্র। অগ্রেপ্তার-কৃত কর্মীরা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের পথ ধরে অগ্রসর হলো। গোপনে কর্মীদের সাথে যোগাযোগ দাঁড় করানো হলো। শাখা সমূহের সভা ও আলোচনা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সংগঠনকে সক্রিয় রাখার ব্যবস্থা হয়। সাংস্কৃতিক কাজের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হলেও গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের প্রস্তুতি চলতে থাকে। ১৯৫৯ সালে একুশে উদযাপনের প্রস্তুতি নেয়া হলেও সামরিক সরকারের নগ্ন থাবার আগ্রাসনে তা বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয়নি।

ডাকসু নির্বাচন

ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করা হলেও ছাত্র সংসদগুলোর নির্বাচন দেওয়া হয় ১৯৫৯ সালে। নির্দলীয় ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত এই নির্বাচনের ফলাফল সরকারী

অনুকূলে না গিয়ে ছাত্র ইউনিয়ন সহ সরকারবিরোধীদের দিকেই গেল। বিভিন্ন হলে ছাত্র ইউনিয়ন জয়লাভ করে।

সামরিক শাসন জারী হওয়ার পর ছাত্র-জনতার মধ্যে যে মোহের ভাব দেখা গিয়েছিল, অল্প সময়ের ব্যবধানেই তা কাটতে শুরু করে। ডাকসু নির্বাচন তার প্রমাণ। মেডিক্যালসহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও নির্বাচন হয়। বিভিন্ন স্থানেই অনুরূপ চিত্র প্রতিফলিত হয়। ছাত্র ইউনিয়নের নেতৃত্ব আস্থা সহকারে অগ্রসর হয়।

'৬০ সালের দিকে সংগঠনের উন্নতি হতে থাকে। নতুন নতুন কর্মী আসতে থাকে সংগঠনের কাজে। সামরিক শাসনের মধ্যে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সঙ্গত কারণেই সংগঠনের বিপর্যস্ত অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু '৬০ সালের দিকে এসে দ্রুত অবস্থার পরিবতন হতে থাকে।

এ বছর একুশে ফেব্রুয়ারীতে আর সরকারী ভ্রুকুটি কার্যকরী হতে পারেনি। পাড়া, মহল্লা থেকেও প্রভাত ফেরী বের হয়। ঢাকা সহ বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক অংশগ্রহণের মাধ্যমে একুশে উদ্‌যাপিত হয়।

এই সময়ে স্বাধীন বাংলার চিন্তার প্রসার লাভ করতে থাকে। সরকারী কর্মচারী, সামরিক কর্মচারী, ছাত্র-যুবকদের মধ্যে এই চিন্তা বিশেষভাবে জাগ্রত হয়। আইয়ুবের স্বৈরশাসন কায়েম হওয়ার ফলে যে শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থার সৃষ্টি হয় তা থেকে বের হওয়ার পথ হিসেবে এই চিন্তা স্ফূরিত হয়। পাকিস্তানের মধ্যে আর সমস্যা সমাধানের পথ নেই—স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই আকাঙ্ক্ষিত ভবিষ্যৎ গড়ে তোলা যাবে বলে এই চিন্তাকারীরা মনে করতে থাকেন। সংবাদ, ইত্তেফাকে এই সময় গণতন্ত্র ও জাতীয় অধিকারের স্বপক্ষে ও সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন নিবন্ধ প্রকাশ হয়। জনমনে এর প্রভাব পড়তে থাকে।

শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট

আইয়ুব সরকার ক্ষমতায় এসে শিক্ষা সচিব ডঃ এস, এম, শরীফকে চেয়ারম্যান করে যে শিক্ষা কমিশন গঠন করেন সে কমিশন রিপোর্ট পেশ করে ১৯৫৯ সালে। এই রিপোর্টে উলঙ্গভাবে শিক্ষা সংকোচনের কথা বলা

হয়। ধনীর সন্তানদের জন্য শিক্ষার দরজা খোলা রাখার ব্যবস্থা করে গরীবদের জন্য তা কার্যত বন্ধ করে দেয়া হয়। ডিগ্রী কোর্স ৩ বছরের করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্বশাসন কেটে দেয়া হয়। নতুন সিলেবাসে বিকৃত সব বিষয়বস্তু পাঠ্যতালিকাভুক্ত করা হয়। এই রিপোর্ট কার্যকরী করা শুরু হতেই ছাত্র বেতন বৃদ্ধি পায় এবং ছাত্র ছাত্রীদের জীবনে আরও বহু সমস্যার সৃষ্টি হয়। ফলে ছাত্র অসন্তোষ ও বিক্ষোভ দানা বাঁধতে থাকে।

আন্দোলনের প্রস্তুতি

সামরিক শাসন উচ্ছেদ করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও শিক্ষানীতি বাতিলের লক্ষ্যে আন্দোলন গড়ে তোলার প্রস্তুতি চলতে থাকে ১৯৬০ এর পর থেকে। ছাত্র ইউনিয়নের পক্ষ থেকে ছাত্রলীগের সাথে আলোচনা হয়। ছাত্র লীগ সংগঠনের তখন ঝিমানো অবস্থা। নির্বাচন হলে একটু তৎপর হয়, অন্য সময় চুপচাপ। ছাত্রলীগকে চাঙ্গা করার প্রচেষ্টাও ছাত্র ইউনিয়ন নেতৃত্ব গ্রহণ করে। গোপনে যোগাযোগ দাঁড় করানো হয়—আন্দোলনে যাওয়ার আগে উভয় সংগঠন সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করে।

ডাকসু হল সংসদের সাথে যৌথভাবে একুশে ফেব্রুয়ারী সহ অন্যান্য অনুষ্ঠান করার মধ্য দিয়ে সাধারণ ছাত্রদের সাথেও নিবিড় যোগাযোগ স্থাপিত হয়। ডাকসুর উদ্যোগে রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। ডাকসুতে তখন ছাত্র ইউনিয়ন ক্ষমতাসীন। সহ সভানেত্রী জাহানারা বেগম ও সাধারণ সম্পাদক অমুল্য চক্রবর্তী রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে সমবেত হওয়ার জন্য ছাত্র জনতার প্রতি আহ-বান জানান। হাজার মানুষের ঢল নামে কার্জন হলে। ছাত্র ইউনিয়ন ও ছায়ানটের যৌথ ব্যবস্থাপনায় যে অনুষ্ঠান হয় তার কথা দর্শক শ্রোতারা অনেকদিন মনে রেখেছে। সরকার প্রথম থেকেই ওই অনুষ্ঠান বন্ধ করতে চেয়েছিল। অনুষ্ঠান বন্ধ করতে অপারগ হলেও পরবর্তী সময়ে গ্রেপ্তার করা হয় অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের। ডাকসু কার্যালয়ে গোয়েন্দাদের আনা-গোনা চলতে থাকে। মেয়েরা কেন লাল শাড়ী, লাল টিপ পড়েছিল—তাও এদের জিজ্ঞাসার বিষয়।

এই অনুষ্ঠানের ফলে জাতীয়তাবাদী চেতনা আরও সংগঠিত হওয়ার সুযোগ পায়। ইতিপূর্বে সৃষ্ট স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার চিন্তা আরও শক্তি পায়।

শিক্ষা নিয়ে ছাত্র বিক্ষোভ, গণতন্ত্রের দাবীতে সংগ্রাম, জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকাশ—ইত্যাদির ফলে একটা ধুমায়িত অবস্থার সৃষ্টি হয় ১৯৬১ সালের দিকে পূর্ব পাকিস্তানে। ছাত্রদের মধ্যে সরকার বিরোধী মনোভাব তীব্র হতে থাকে। কিন্তু রাজনৈতিক দল সমূহের সক্রিয় তৎপরতা ছাড়া আন্দোলন সফল হতে পারে না—ছাত্র ইউনিয়ন এ সম্পর্কে সচেতন ছিল। রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য এ সময়ে প্রচেষ্টা চলতে থাকে। গোপন কমিউনিস্ট পার্টি ও আওয়ামী লীগের মধ্যে এ সময়ে আন্দোলন নিয়ে আলোচনা হয়। ডিসেম্বরের শেষ দিকে ছাত্র ইউনিয়নও মূল সংগঠকদের সভা করে আসন্ন আন্দোলনের প্রস্তুতি আলোচনা করে। একুশে ফেব্রুয়ারী ধরেই আন্দোলন অগ্রসর করার প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়।

আইয়ুবের তখতে প্রথম ধাক্কা

একটা আচ্ছাদন দিয়ে সামরিক শাসনকে পাকাপাকিভাবে চালু রাখার মানসে আইয়ুব খান একটি শাসনতন্ত্র দিতে প্রয়াসী হন। তথাকথিত গণতন্ত্রের নামে এই উদ্ভট শাসনতন্ত্রের নামে আইয়ুবের স্বেচ্ছাচার ছাত্র সমাজ কখনো মেনে নিতে পারে না। ছাত্র ইউনিয়ন থেকে গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের দাবী উত্থাপন করা হয়। রাজনৈতিক দল সমূহের ঐক্য গড়ে তোলার জন্যও ছাত্র ইউনিয়ন যোগাযোগ করে। এই সময়ে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দের সাথে আওয়ামী লীগের আলোচনার ভিত্তিতে ঠিক হয় যে, সোহরাওয়র্দী সাহেব সামরিক আইন প্রত্যাহার ও গণতন্ত্রের দাবীতে একটি বিবৃতি দেবেন। কিন্তু ঘটনা চক্রে তিনি গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন ৩০শে জানুয়ারী, ১৯৬২। গ্রেপ্তারের ঘটনার তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় জনমনে। ছাত্র সমাজও বিক্ষুব্ধ হয়। ৩১শে জানুয়ারী ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্র লীগের বৈঠক হয়। যে আন্দোলন শুরু করার চিন্তা ছিল ২১শে

ফেব্রুয়ারী, ঘটনা চক্রে তা এগিয়ে এলো। ১লা ফেব্রুয়ারী সাধারণ ছাত্রদের নামে ডাকা হয় ছাত্র ধর্মঘট।

১লা ফেব্রুয়ারী থেকে ৫ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট চলে। মিছিলে মিছিলে প্রকম্পিত হয় ঢাকার রাজপথ। ৫ তারিখ বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়। ৬ তারিখ এর প্রতিবাদে বিরাট ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় আমতলায়। সমাবেশ শেষে মিছিল কার্জন হল হয়ে সামনে অগ্রসর হতে গেলে পুলিশ বাঁধা দেয়। শুরু হয়ে যায় সংঘর্ষ। এক পর্যায়ে মিছিলের একটি বড় অংশ নাজিমুদ্দিন রোড হয়ে পুরানো ঢাকায় ঢুকে যায়। ছাত্র ইউনিয়নের নেতৃত্বে পরিচালিত এ মিছিলে জনগণও যোগ দেয়। ফলে ঢাকায় কার্যতঃ হরতাল হয়ে যায়। ৭ই ফেব্রুয়ারীও বিশাল মিছিল বক্‌শীবাজার হয়ে পুরানো ঢাকায় প্রবেশ করে। ছাত্রদের পরিচালিত আন্দোলন পরিণত হয় জনতার আন্দোলনে। ঐ দিন রাতে হলগুলো ঘেরাও করে পুলিশ ও সেনাবাহিনী। জোর করে ছাত্রদের বের করে দেয়া হয়। ছাত্র নেতৃবৃন্দের নামে জারী হয় হুলিয়া। কিন্তু আন্দোলনকে থামানো আর সম্ভব হয় না—আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে নগর থেকে শহরে—শহর থেকে গ্রামে—দেশের সর্বত্র। প্রথম সামরিক আইন ভঙ্গের চমকে পুলকিত হয় দেশবাসী।

মার্চ মাসে বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পর আবার আন্দোলন চাঙ্গা হয়। জুন মাসের ২৪ তারিখে ৯ নেতার যুক্ত বিবৃতি প্রকাশ হলে ছাত্র জনতার মধ্যে উৎসাহের সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন দল পুনরুজ্জীবিত না করে ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট গঠন করা হয়। ঢাকাসহ সারা দেশে বিশাল বিশাল জনসভা হয়। আগস্ট মাসে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ আইয়ুব প্রদত্ত শিক্ষা নীতি বাতিলের দাবীতে আন্দোলন শুরু করে। ১৭ই সেপ্টেম্বর আহ্বান করা হয় হরতালের। সেদিন পুলিশের গুলিতে নিহত হন মোস্তফা, বাবুল, ওয়াজিউল্লাহ। এভাবে রক্তস্রোতের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয় সংগ্রাম। আইয়ুব বাধ্য হয় মাথা নত করতে। শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন

আংশিক স্থগিত ঘোষিত হয়। রাজনৈতিক অধিকার হয় স্বীকৃত।

কনভেনশন

১৯৬২ সালের ২০ ও ২১শে অক্টোবর ঢাকার স্বামীবাগ রোজগার্ডেনে দীর্ঘদিন পর ছাত্র ইউনিয়নের কর্মীরা একটি কনভেনশনে মিলিত হন। আন্দোলন-সংগ্রামের ফলে ছাত্রদের সাথে নতুন নতুন যোগাযোগ স্থাপিত হয় সারা দেশে। ঢাকায়ও কেন্দ্রীয় কাজের সাথে যুক্ত হয়েছে অনেক নতুন অথচ সম্ভাবনাময় মুখ। কনভেনশন তাই নতুন সম্ভাবনার আলোকে উজ্জ্বল। কনভেনশনে উপস্থিত প্রতিনিধিরা আন্দোলনের অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করেন—। আন্দোলনকে অগ্রসর করে নিতে হবে—স্বৈর শাসনের অবসান ঘটিয়ে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে—এই মূল বক্তব্যের মধ্য দিয়ে কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। কনভেনশনে আহমেদ জামাল সভাপতি ও কাজী জাফর আহমেদ সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। পরবর্তীতে জয়নাল আবেদীন কার্যকরী সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।

নতুন কমিটির উদ্যোগে সারা দেশে ব্যাপক সাংগঠনিক তৎপরতা শুরু হয়। আন্দোলনের সময় যে সব নতুন নতুন যোগসূত্র রচিত হয়েছে সেগুলির সাথে সাংগঠনিক যোগাযোগ স্থাপিত হয়। একদিকে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের কাজ, অন্যদিকে সংগঠনের কাজ। হুলিয়া, নির্যাতন ইত্যাদি মাথা পেতে নিয়েই ছাত্র ইউনিয়ন নেতৃত্ব কাজে অগ্রসর হন এবং খুব শীঘ্রই একটি শক্তিশালী সংগঠন গড়ে তুলতে সক্ষম হন। যার উপর ভিত্তি করে আরও বড় সংগ্রামের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়।

সম্মেলন, ১৯৬৩

১৯৬৩ সালের ১৭, ১৮ ও ১৯শে এপ্রিল ছাত্র ইউনিয়নের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় রেলওয়ে মিলনায়তনে। সম্মেলনের প্রথম দিন একটি সুসজ্জিত র‍্যালী ঢাকা শহর প্রদক্ষিণ করে শহরবাসীকে তাক লাগিয়ে দেয়। শেষ দিনে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে আকর্ষণীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের

দ্বারা দর্শক শ্রোতার হৃদয়ে ছাত্র ইউনিয়নের নাম স্থায়ী আসন গাড়তে সক্ষম হয়। নতুন পটভূমিতে সংগঠনের খসরা ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র গ্রহণ করা হয়। প্রায় সব জেলা থেকে আগত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে সভাপতি নির্বাচিত হন বদরুল হক এবং সাধারণ সম্পাদক হন হায়দার আকবর খান রনো। পরবর্তী সময়ে বদরুল হক গ্রেপ্তার হয়ে গেলে কার্যকরী সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন পংকজ ভট্টাচার্য। এক সময়ে নুরুর রহমান কার্যকরী সাধারণ সম্পাদক হন। ছাত্র ইউনিয়নকে রাজনৈতিক ও সাংগঠনিকভাবে মজবুত করার শ্লোগান নিয়ে প্রতিনিধিরা সম্মেলন উত্তরকালে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

সম্মেলনের বছর ডাকসু নির্বাচনে ছাত্র উইনিয়ন মনোনীত মেনন-মতিয়া পরিষদ জয়যুক্ত হয়। জগন্নাথ হল, রোকেয়া হলসহ বিভিন্ন হলেও ছাত্র ইউনিয়ন জয়ী হতে সক্ষম হয়। বিভিন্ন কলেজ নির্বাচনেও ছাত্র ইউনিয়ন জয়ী হয়। সারা পূর্ব পাকিস্তানে ছাত্র ইউনিয়ন অনেকটা একক সংগঠনের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ

১৯৬৪ সালের প্রথম দিকে খুলনায় ও কোলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়। এর জের হিসেবে ঢাকায় দাঙ্গা সৃষ্টির অবস্থা হয়। ছাত্র ইউনিয়ন কর্মীরা এর মোকাবেলা করতে বদ্ধপরিকর হলেন। এন. এস. এফ. সরকারী ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের মানসে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সভা করে। ছাত্রলীগ নেতাও এতে বক্তৃতা করে। কিন্তু ছাত্র ইউনিয়ন ঠিক করে 'জীবন দিয়ে হলেও বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে মিছিল বের করায় বাঁধা দেবে।' কারণ এ ধরনের মিছিল থেকে দাঙ্গা সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে। ছাত্র ইউনিয়ন কর্মীরা অক্ষরে অক্ষরে সে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত করে। ডাকসু কার্যালয় তছনছ হয়। নেতাদের মাথা ফাটে। তবুও মিছিল বের হতে পারে না।

দাঙ্গার সম্ভাবনা আছে এমন এলাকায় পালা করে ছাত্র ইউনিয়ন কর্মীরা

পাহাড়া দেয়। খুলনা, ঢাকা, চট্টগ্রাম, পাবনা, ময়মনসিংহ, সিলেট প্রভৃতি স্থানে ছাত্র ইউনিয়ন কর্মীরা দাঙ্গা প্রতিরোধের কাজে ও দাঙ্গা বিধ্বস্তদের সাহায্যের কাজে আত্মনিয়োগ করে। ঢাকায় জগন্নাথ হল ও জগন্নাথ কলেজের দু'টি ত্রাণকেন্দ্র ছাত্র ইউনিয়ন কর্মীরা পরিচালনা করে।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর আর একটি জটিলতার সৃষ্টি হয়। অবাঙ্গালীরা দাঙ্গা করেছে—এই অজুহাতে বাঙালী-অবাঙালী দাঙ্গা বাধার উপক্রম হয়। এই অবস্থায়ও ছাত্র ইউনিয়ন তা প্রতিহত করে। এসব কাজের মধ্য দিয়ে ছাত্র ইউনিয়ন প্রকৃত মানব হিতৈষী সংগঠক হিসেবে জনমনে প্রতিষ্ঠিত হতে সক্ষম হয়।

সার্বজনীন ভোটাধিকারের আন্দোলন

দাঙ্গা সৃষ্টি করে গণতন্ত্রের জন্য আন্দোলন বন্ধ করতে প্রয়াসী হয়েছিল পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী। কিন্তু তা আর তারা পারল না। খুব তাড়াতাড়ি প্রত্যক্ষ নির্বাচন ও সার্বজনীন ভোটাধিকারের দাবীতে আন্দোলন গড়ে ওঠে। ২১ শে ফেব্রুয়ারীতে ছাত্র ইউনিয়ন থেকে এটাই ছিল মূল শ্লোগান। ছাত্রলীগ ও ছাত্রশক্তির সাথেও এই বিষয়ে আলোচনা হয় এবং এই প্রশ্নে তাদের সাথে ছাত্র ইউনিয়নের সমঝোতা হয়। তিন সংগঠনের পক্ষ থেকে রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে আলোচনা অব্যাহত থাকে।

এই প্রচেষ্টার ফলে ১৯শে মার্চ দেশব্যাপী ভোটাধিকার দিবস পালিত হয়। দেশের সর্বত্র সর্বাত্মক হরতাল পালনের মধ্য দিয়ে দাঙ্গার ক্ষত মুছে গিয়ে আন্দোলনের কাফেলা অপ্রতিহত গতিতে এগুতে থাকে।

সমাবর্তন উৎসব

পূর্ব পাকিস্তানের সবচেয়ে ঘৃণিত গভর্নর মোনায়েম খাঁ চ্যান্সেলার হিসেবে ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্তন উৎসবে আসার পায়তারা করলে ছাত্র সমাজ প্রতিরোধ করে। ব্রিটিশ আমলে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী হিসেবে গভর্নর সমাবর্তনে পৌরহিত্য করার সম্মান পেতেন। কিন্তু ব্রিটিশ-উত্তরকালে তার পরিবর্তন করা প্রয়োজন। 'বিতর্কের ঊর্ধ্বে' একজন

সম্মানিত শিক্ষাবিদ কিংবা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এই অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করবেন'—এই ছিল ছাত্র ইউনিয়নের দাবী। এই দাবীই ছাত্র সমাজের দাবীতে পরিণত হয়।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্তন উৎসব থেকে ছাত্রদের প্রতিরোধের মুখে মোনায়েম খাঁ পালিয়ে আসতে বাধ্য হন। ২২শে মার্চ ছিল উৎসব অনুষ্ঠানের দিন। এর আগে থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বত্র পুলিশ মোতায়েন করা হয়। তবুও ছাত্ররা বীর বিক্রমে প্রতিরোধ করে। ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষের পরিণতিতে সমাবর্তন উৎসব লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়।

এই ঘটনার জের ধরে ছাত্র সমাজের উপর বর্বর হামলা শুরু হয়। ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ অনেক নেতৃস্থানীয় কর্মীরা গ্রেফতার হন। অনেকের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী হয়। রাস্তা-ঘাটে ছাত্রদের উপর পুলিশ ও গুণ্ডাবাহিনীর মারপিট চলতে লাগলো।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ জনের ডিগ্রী কেড়ে নেয়া হয়। ছাত্র ইউনিয়ন সভাপতিসহ ২২জনকে রাসটিকেট করা হয় ও ২৪ জনের উপর ১ বছরের জন্য মুচলেকা সইয়ের আদেশ জারী করা হয়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়েও কয়েক-জনকে বহিস্কার করা হয় ও রাকসু বাতিল করে দেয়া হয়। ঢাকা কলেজ থেকে ১০ জন ও আর্ট কলেজ থেকে ৭ জনকে বহিস্কার করা হয়েছিল। ইক-বাল হলে রাতে পুলিশ ও গুণ্ডাদের সশস্ত্র হামলাও এখানে উল্লেখযোগ্য।

মোনায়েম শাহী ও এন. এস. এফের সেই কালো অধ্যায়ের দিনগুলোতে ছাত্র ইউনিয়ন সব হামলা নির্যাতনের মুখেও বিপ্লবী সৈনিকের ভূমিকা নিয়ে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে গিয়েছে। ছাত্রদের ডিগ্রী বাতিল ও বহিষ্কা-রের অন্যায় আদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে রীট করা হয়। ছাত্র ইউনিয়ন নেতা জাকির আহমদ এ রীট আবেদন করেন। হাইকোর্ট ছাত্রদের পক্ষে রায় দেয়।

২২ দফা দাবী

ছাত্র-গণ আন্দোলনের 'মুল সনদ' প্রস্তুত করার জন্য ছাত্র ইউনিয়ন

পরিকল্পনা গ্রহণ করে। সনদ প্রস্তুত করে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তান ভিত্তিক একটি কনভেশন আহ্বান করে ছাত্রগণ আন্দোলনের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখার পরিকল্পনা ছিল ছাত্র ইউনিয়নের। ছাত্র লীগ ও ছাত্র শক্তির সাথে আলোচনা চলে মাসাধিককাল। রচিত হয় ২২ দফা কর্মসূচী। শিক্ষা বিষয়ক দাবী, ছাত্র নির্যাতন বন্ধ ইত্যাদি দাবীই এর মধ্যে স্থান পায়। 'মূল সনদ' রচিত হলেও কনভেনশন করতে অপর দুই সংগঠন রাজী হয়না। তখন বাধ্য হয়ে ৬৪ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর ঢাকা নগরের কর্মীদের এক সমাবেশে তা উপস্থাপন করে গ্রহণ করানো হয়।

২২ দফার ভিত্তিতে সংগ্রামের প্রথম পদক্ষেপ ১৭ই সেপ্টেম্বর। সরকারী গুণ্ডামী ছাত্রদের স্তব্ধ করে দিতে চায়। ফলে কয়েকবার পুলিশের সাথে খণ্ডযুদ্ধ হয়ে গেলো। শহরবাসীও এসে যোগ দেয় ছাত্রদের সাথে। ছাত্রবন্দী ও রাজবন্দীদের মুক্তির দাবীতে ২৯শে সেপ্টেম্বর পালিত হয় প্রতিবাদ দিবস। ছাত্র ইউনিয়ন ও অন্য দু' সংগঠনের পক্ষ থেকে রাজনৈতিক দলগুলোকে অনুরোধ করা হয় ২৯শে সেপ্টেম্বর হরতাল আহ্বানের জন্য। পালিত হয় সর্বাত্মক হরতাল।

ডাকসু সাধারণ সম্পাদিকা মতিয়া চৌধুরীর গ্রেপ্তার, ছাত্রী মিছিলে পুলিশের হামলার প্রতিবাদে ঢাকায় ছাত্রীসহ ব্যাপক সংখ্যক মহিলা ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করে গভর্ণর হাউসের সামনে বিক্ষোভ করেন। এই বিক্ষোভ সংগঠিত করার উদ্যোগ নিয়েছিল ছাত্র ইউনিয়ন।

তিন ছাত্র সংগঠনের ঐক্য বেশ সক্রিয় ছিল। ১৯৬৫ সালে বিভিন্ন নির্বাচনে এন. এস. এফের বিরুদ্ধে যৌথ প্যানেল দেয়া হয় এবং তা জয়যুক্ত হয়। এককভাবে ছাত্র ইউনিয়ন অনেক স্থানে জিততে পারলেও ঐক্যের পথ ধরেই অগ্রসর হয়।

সাংস্কৃতিক কাজ

ছাত্র ইউনিয়ন বরাবরই সুস্থ সাংস্কৃতিক ধারা এগিয়ে নিতে প্রয়াসী। ১৯৬৩-৬৪ সালেও কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক টিম বিভিন্ন জেলা সফর করে এবং

অনেক সফল অনুষ্ঠান করে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও ফাতেমা জিন্নার নির্বাচনের পর শহীদ দিবসে শহীদ মিনারে গণসঙ্গীতের আসর বসানো হয়। ছাত্র ইউনিয়নের এ অনুষ্ঠান দেখে হাজার হাজার মানুষ নিকট অতীতের গ্লানি দূরীভূত করে আশায় বুক বাঁধতে সক্ষম হয়। ১৯৬৪র 'সূর্যজ্বালা' সংকলন পুলিশ প্রেস থেকে নিয়ে যায়। এই সময়ে যেসব সংকলন প্রকাশ হয় তা আসলেই প্রশংসার দাবীদার। সংগ্রামের শপথ আর জাতীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতিধ্বনিতে মুখর ছিল ছাত্র ইউনিয়নের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচন

২রা জানুয়ারী, ১৯৬৫ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। ৮০ হাজার মৌলিক গণতন্ত্রী ভোটার। নির্বাচনে সম্মিলিত বিরোধীদলের প্রার্থী হিসেবে মিস্ ফাতেমা জিন্নাহকে মনোনীত করা হয়। ছাত্র ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় সংসদের সভা করে ঠিক করা হয়, 'দেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের পক্ষ সমর্থন করা এবং মিস্ জিন্নাহর জয়ের জন্য চেষ্টা করা।' গণতান্ত্রিক ছাত্র সংগঠন সমূহকে এই ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ করার উদ্যোগ ছাত্র ইউনিয়ন গ্রহণ করে।

নির্বাচনের এ কাজকে ছাত্র ইউনিয়ন সংগঠিত আন্দোলন হিসেবে পরিচালনা করে। স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম হিসেবে এই নির্বাচনে ছাত্র ইউনিয়ন কর্মীরা সারাদেশে নিজ নিজ দায়িত্বে সাধ্যাতীত কাজ করে যায়।

মাওবাদীরা সংগঠন ত্যাগ করেঃ ১৯৬৫

এপ্রিলের ১, ২, ৩, তারিখে সম্মেলন হয় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে। সম্মেলনের অনেক আগে থাকতেই সংগঠনের একাংশের মধ্যে মাওবাদের প্রভাব সৃষ্টি হয়। মাওবাদের গরম কথায় আকৃষ্ট হয়ে এরা সংগঠনের মধ্যে কতকগুলো বিভ্রান্তি নিয়ে আসতে চেষ্টা করে। আইয়ুব সরকার সম্পর্কেও মোহগ্রস্ত বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়।

সম্মেলনের সময় এরা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে সম্মেলন পণ্ড করে দিতে সচেষ্ট হয়। এসব সত্ত্বেও ছাত্র ইউনিয়ন নেতৃত্ব গঠনতান্ত্রিক রীতি মোতাবেক

সম্মেলন সমাপ্ত করতে উদ্যোগী হন। কার্যকরী সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্টেও এ বিষয়ে উল্লেখ করা হয়।

'…রাজনৈতিক মত, চিন্তাধারা, পছন্দ-অপছন্দ প্রভৃতির মধ্যে বিভিন্নতা থাকাই স্বাভাবিক। বিভিন্ন প্রশ্নে মত দেওয়া একটি গণতান্ত্রিক সংগঠনেরই বৈশিষ্ট্য। ইহা সংগঠনের পক্ষে ক্ষতিকারক নয়। আমাদের গঠনতন্ত্র ও ঘোষণাপত্রের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামত অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয়ে একটি মতে পৌঁছতে হবে এবং সংগঠনের গৃহীত সিদ্ধান্তকে সকলে মিলে কার্যকরী করার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করতে হবে…।'

কিন্তু গণতান্ত্রিক পদ্ধতির ধারকাছ দিয়েও দলছুটরা গেল না, সম্মেলনে হামলা করে তারা সম্মেলনকে পণ্ড করে দিতে সচেষ্ট হয়। এই অবস্থায় সম্মেলনের স্থান পরিবর্তন করে ইকবাল হলে নিয়ে আসা হয়। শতকরা ৮০ ভাগ প্রতিনিধির উপস্থিতিতে সম্মেলনের কাজ শেষ হয়। মতিয়া চৌধুরীকে সভাপতি ও সাইফউদ্দিন আহ্‌মেদ মানিককে সাধারণ সম্পাদক করে নতুন কমিটি গঠন করা হয়।

সম্মেলন উত্তরকালে সঙ্গত কারণেই নতুন নেতৃত্বকে অধিকতর গুরুত্ব-সহকারে সংগঠন গুছানোর কাজে অগ্রসর হতে হয়। দলছুটদের বিভ্রান্ত-কর বক্তব্যের অসারতা প্রমাণ করে সঠিক বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সংগঠনের নেতৃত্ব নিরলস প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন। সংগঠনের সকল পর্যায়ে ব্যাপক রাজনৈতিক আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়। ঢাকাসহ সারাদেশে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব চষে বেড়াতে থাকেন। অসাম্প্রদায়িক, জাতীয় অধিকারের প্রশ্ন ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এর ফলে একদিকে মাওবাদীদের বিভ্রান্তিকর বক্তব্যের জবাব দেয়া হয়। অন্যদিকে কর্মীদের রাজনৈতিক চেতনার মানও বৃদ্ধি পায়। নেতৃবৃন্দের প্রচেষ্টায় খুব স্বল্প সময়ে সংগঠন গুছিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রশ্নে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ছাত্র ইউনিয়ন ভবিষ্যৎ আন্দোলনের প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

পাক-ভারত যুদ্ধ

১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বরে পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধ দ্বারা নয়, শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হওয়ার জন্য ছাত্র ইউ-নিয়নের পক্ষ থেকে আহ্বান জানানো হয়। এই সময়ে এন, এস, এফ-এর পক্ষ থেকে ছাত্র ইউনিয়নের অনেক কর্মীর উপর "ভারতের দালাল" বলে হামলা চালানো হয়। তবুও ছাত্র ইউনিয়ন সঠিক বক্তব্যে অটল থাকে। মাওবাদীরা এই যুদ্ধে আইয়ুবকে সমর্থন করেছিল।

ছয় দফা

যুদ্ধোত্তর পাকিস্তানে ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারীতে শেখ মুজিবর রহমান ছয় দফা কর্মসূচী ঘোষণা করেন। প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন, দেশরক্ষা-বাণিজ্য-পররাষ্ট্র বিষয়ের উপর প্রদেশের আংশিক নিয়ন্ত্রণ সম্বলিত এই ছয় দফায় বাঙ্গালীর জাতীয় স্বার্থের কথা প্রতিফলিত হয়। আওয়ামী লীগ-ছাত্রলীগ থেকে বলা হয়, ছয় দফা হচ্ছে 'মুক্তি সনদ'। অন্যদিকে মাও-বাদীরা বলে এটা সি, আই, এর দলিল। ছাত্র ইউনিয়ন এর কোনটিকেই সঠিক বলে মনে করেনি। ছয় দফা ন্যায্য, তবে অসম্পূর্ণ। এই দাবীসহ পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচীর ভিত্তিতে আন্দোলনে অগ্রসর হওয়ার জন্য ছাত্র ইউনিয়ন আহ্বান জানায়। ৭ই জুনের যে হরতালে শ্রমিক মনু মিয়াসহ অনেকে শহীদ হন—তাতে ছাত্র ইউনিয়ন সমর্থন দান করে। সেদিন মুজাহিদুল ইসলাম সেলিমসহ বেশ কয়েকজন ছাত্র ইউনিয়ন কর্মী গ্রেফতার-নির্যাতন ভোগ করেন।

দশম সম্মেলন

১৯৬৬ সালের শেষ দিকে ৪ দিনব্যাপী দশম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে। মাওবাদীদের বের হয়ে যাওয়ার পর প্রথম এই সম্মেলনে নীতি নির্ধারনের প্রশ্নে বিস্তারিত আআলোচনার পর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রশ্নে সঠিক বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়। পূর্বেকার সম্মেলনে সংগঠনের ঐক্য নষ্ট হওয়ায় আন্দোলনের যে ক্ষতি হয় তা

কাটিয়ে উঠে স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে ব্যাপকভিত্তিক আন্দোলন গড়ে তোলার বক্তব্য নিয়ে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন উদ্বোধন করেন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আবুল ফজল। সম্মেলন উপলক্ষে আয়োজিত ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরন করেন ইংলিশ চ্যানেল বিজয়ী প্রখ্যাত সাতারু শ্রী ব্রজেন দাস। সম্মেলনের প্রথম দিন বাংলা একাডেমীতে অনুষ্ঠিত হয় গণসঙ্গীতের আসর । শেষ দিনে মঞ্চস্থ হয় তাসের দেশ। ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে সভাপতি হন সাইফুদ্দিন আহমেদ মানিক ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন সামসুদ্দোহা।

সংকট কাটিয়ে ছাত্র ইউনিয়ন সংগঠন আবার শক্তিশালী সংগঠনের রূপ লাভ করার অবস্থা এই সম্মেলনে পরিলক্ষিত হয়। সম্মেলন উত্তর-কালে ডাকসু নির্বাচনে ছাত্র ইউনিয়ন মনোনীত মাহফুজা-মোর্শেদ পরিষদ জয়লাভ করে। দেশের বিভিন্ন কলেজেও ছাত্র ইউনিয়ন জয়লাভ করতে থাকে।

পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর বাঙালী সংস্কৃতি-ঐতিহ্য বিরোধী বক্তব্য প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে এদেশের বুদ্ধিজীবীরা যে কর্মসূচী গ্রহণ করেন-ছাত্র ইউনিয়ন তাতে অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নিজস্ব উদ্যোগে পহেলা বৈশাখ পালন, রবীন্দ্র-নজরুল-সুকান্তের উপর অনুষ্ঠান, সুস্থ সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে জাতীয়তাবোধের ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে ছাত্র ইউনিয়ন।

আন্দোলনের প্রস্তুতি

আইয়ুবের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে একটি পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচীর ভিত্তিতে গণ-আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে ছাত্র ইউনিয়ন দশম সম্মেলনউত্তরকালে আপ্রাণ চেষ্টা চালায়। স্বায়ত্বশাসন, গণতন্ত্র, শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-যুবকের নিজস্ব দাবী, জাতীয়করণ, জোটনিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা ইত্যাদি বক্তব্যের ভিত্তিতে ছাত্র জনতার মধ্যে ছাত্র ইউনিয়ন ব্যাপক প্রচারকাজ পরিচালনা করে। সভা-সমাবেশ, প্রচারপত্র, পোস্টার

ইত্যাদির মাধ্যমে বক্তব্য তুলে ধরার ফলে ছাত্রজনতার মধ্যে আন্দোলনের পক্ষে মনোভাব চাঙ্গা হয়ে উঠে।

ছাত্রলীগের সাথে আলোচনা চলতে থাকে। '৬৭ সালে ডাকসু নির্বাচনে প্রোগ্রাম ভিত্তিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। মেনন গ্রুপের মধ্যে আন্দোলনের পক্ষে নবতর উপলব্ধি আসে। এমনকি সরকার সমর্থক এন, এস, এফ-এর একটা অংশের মধ্যেও সরকার বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে ওঠে।

রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আন্দোলনের প্রশ্নে সমঝোতা গড়ে উঠতে থাকে। আওয়ামী লীগ ও ন্যাপ মিলে সংযুক্ত বিরোধী দল গঠন করে। অন্যান্য দলের সাথেও গণতন্ত্রের সংগ্রামের প্রশ্নে আলোচনা চলতে থাকে। আসন্ন মৌলিক গণতন্ত্রের নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করার বিষয়টিও সামনে আসে।

সরকারী নির্যাতনের প্রতিবাদে ১৮ই নভেম্বর (১৯৬৮) ছাত্র সংগঠনগুলোর আহ্বানে প্রতিবাদ দিবস পালিত হয়। পশ্চিম পাকিস্তানেও ভুট্টোর মুক্তির দাবীতে ছাত্র বিক্ষোভ শুরু হয়ে যায়। রিক্সাচালক হত্যার প্রতিবাদে ডিসেম্বরে (৭,৮) ঢাকায় হরতাল হয়। ১৩ই ডিসেম্বর আওয়ামী লীগ ও ন্যাপের উদ্যোগে প্রদেশব্যাপী পালিত হয় প্রতিবাদ দিবস।

এই আন্দোলনমুখী পরিস্থিতিতে আন্দোলনের কর্মসূচী প্রণয়ন করে দৃঢ়ভাবে অগ্রসর হওয়ার লক্ষ্যে ছাত্র ইউনিয়ন তার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে। ছাত্রলীগ, মেনন গ্রুপ ছাত্র ইউনিয়ন, মাহবুবুল হক দোলন ও নাজিম কামরান পরিচালিত এন, এস, এফ-এর সাথে ছাত্র ইউনিয়নের কর্মসূচী ভিত্তিক ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ১লা জানুয়ারী (১৯৬৯) বিশ্ববিদ্যালয় খোলার প্রথম দিন থেকে আন্দোলনের শুরু করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়।

১১ দফা

১লা জানুয়ারী প্রতিবাদ দিবসে বিরাট ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়। এর পর ৬ দফার সাথে ছাত্র-কৃষক-শ্রমিক-কর্মচারীদের দাবী, জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি, জাতীয়করণ ইত্যাদি দাবী যুক্ত করে রচিত হয় ১১ দফা

কর্মসূচী। ৪টি সংগঠন মিলে গঠিত ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পাশাপাশি ৮টি রাজনৈতিক দল গঠন করে ডেমোক্রেটিক অ্যাকশান কমিটি (ডাক)। শুরু হয় ১১ দফার ভিত্তিতে ঐতিহাসিক লড়াই।

গণ অভ্যুত্থান

১৭ই জানুয়ারী দাবী দিবসে ছাত্রজনতা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে। সংগ্রামের কাফেলা অপ্রতিহতভাবে এগিয়ে চলে ১৮, ১৯, ২০ তারিখ পর্যন্ত। ছাত্র জনতার পদভারে প্রকম্পিত হয় ঢাকা নগরী। ২০ তারিখ মেডিক্যালের সামনে শহীদ হন ছাত্র নেতা আসাদ। ২১ তারিখ হয় হরতাল। ২২, ২৩ ও ২৪ তারিখ পালিত হয় শোকের কর্মসূচী। ২৪শে জানুয়ারী প্রদেশব্যাপী হরতাল পালিত হয়। ঐ দিন সর্বস্তরের মানুষ নামে রাজপথে। নিহত হয় স্কুল ছাত্র মতিউরসহ অনেকে। জনতার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ রূপ লাভ করে গণ অভ্যুত্থানে। কারফিউ, গুলি উপেক্ষা করে মানুষের ঢল নামে রাজপথে। সরকার কার্যতঃ অচল হয়ে যায়।

আন্দোলনকে সঠিকখাতে প্রবাহিত করার জন্য ছাত্র ইউনিয়ন সে সময়ে কতকগুলো বাস্তব পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের মাধ্যমে তা বাস্তবায়িত করার উদ্যোগ নেয়। আন্দোলনকে পরিকল্পিতভাবে নিচের দিকে ছড়িয়ে দেওয়া এবং একটা যৌক্তিক পরিনতির দিকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য ছাত্র ইউনিয়নের প্রস্তাব মতো ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ৮ দফা নির্দেশাবলী প্রচার করে। প্রত্যেক জেলা, মহকুমা, থানা, গ্রাম, মহল্লা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা, জনগণকে আন্দোলনে সামিল করানো, বিশৃঙ্খলা রোধ করে সরকারী উস্কানী প্রতিহত করা, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন, সর্বত্র জনসভা-মিছিল ইত্যাদি কর্মসূচী সম্বলিত নির্দেশাবলী প্রেরণ করা হয় ও সে মোতাবেক আন্দোলনকে অগ্রসর করানোর জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চলতে থাকে। এদিকে সরকার ঢাকাসহ বিভিন্ন স্থানে কারফিউ জারী করে, সেনাবাহিনী তলব করে। হাজার হাজার গ্রেপ্তার করতে থাকে। কিন্তু আন্দোলন না থেমে উত্তরোত্তর

বৃদ্ধি পেতেই থাকে। ৬ই ফেব্রুয়ারী 'কালো দিবসে' ঢাকা, লাহোরসহ গোটা পাকিস্তান পরিণত হয় কালো পতাকার দেশে। ৯ই ফেব্রুয়ারী লক্ষ মানুষ ঘেরাও করে ঢাকা সেন্ট্রাল জেল। পরে অবশ্য জনতা নেতৃবৃন্দের অনুরোধে ফিরে আসে।

সরকার বাধ্য হয় মাথা নত করতে। আইয়ুব খাঁ গোল টেবিল বৈঠক আহ্বান করেন। ২১শে ফেব্রুয়ারী সরকারী ছুটি ঘোষণা করা হয়। ২২শে ফেব্রুয়ারী আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করা হয় ও শেখ মুজিবুর রহমান, মণি সিংহসহ রাজবন্দীরা মুক্তি পান। ২৬শে ফেব্রুয়ারী ও ১০ থেকে ১৩ই মার্চ গোল টেবিল বৈঠক হয়। কিন্তু কোন সিদ্ধান্ত ছাড়াই বৈঠক শেষ হয়। জাতীয় ব্যাপক আন্দোলনের মুখে আইয়ুব স্বৈরাচারের আর কিছুই করার থাকল না—২৬শে মার্চ আইয়ুব পদত্যাগ করেন। দেশে জারী হয় আবার সামরিক আইন। এবারের নায়ক ইয়াহিয়া খান।

তিন

স্বাধীনতার বীর সেনানী

৬৯-এর গণ অভ্যুত্থান এদেশে সামরিক একনায়কদের শাসন অচল করে বেসামরিক শাসন প্রতিষ্ঠা অবধারিত করে তুলে। কারোরই এটা অস্বীকার করার উপায় ছিল না। তাই ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করতে বাধ্য হন নির্বাচন দেওয়ার কথা।

একাদশ সম্মেলন

১৯৬৯ সালের শেষ দিকে ছাত্র ইউনিয়নের একাদশ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। একদিনের এই সম্মেলন হয় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে। এ বছর প্রথম দিকে এই সম্মেলন হওয়ার কথা থাকলেও গণঅভ্যুত্থানের জন্য তা হতে পারেনি। আন্দোলনের পটভূমিতে এই সম্মেলনে ভবিষ্যতে আরও বৃহত্তর সংগ্রামের শপথ উচ্চারিত হয়। সম্মেলনে সামসুদ্দোহা সভাপতি ও নুরুল ইসলাম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

ত্রাণ কাজ

১৯৬৯ সালের এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি ডেমরা অঞ্চলে এক প্রলয়ংকরী ঘূর্ণীঝড়ে এলাকায় বিধ্বস্ত অবস্থার সৃষ্টি হয়। ছাত্র ইউনিয়ন সংগঠিত শক্তি নিয়ে বিপর্যস্ত মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। সাধ্যমত সাহায্য সংগ্রহ করে খাদ্য, বস্ত্র, ওষধ সরবরাহ করার পাশাপাশি ধ্বংসপ্রাপ্ত ঘরবাড়ি পুনর্নির্মাণ করার কাজেও ছাত্র ইউনিয়ন কর্মীরা আত্মনিয়োগ করে। ছাত্র ইউনিয়ন এতো নিষ্ঠার সাথে এ কাজ সম্পাদন করে যে, সরকারী ও অন্যান্য ত্রাণ-দলগুলি ও তাদের উপর অনেক ক্ষেত্রে নির্ভর করতে থাকে। কয়েক মাস ধরে অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী ছাত্র ইউনিয়নের ব্যানারে ঐ এলাকায় ত্রাণ কাজে অংশ গ্রহণ করেছিল। ঐ এলাকার শ্রমজীবী মানুষের সাথে ছাত্র ইউনিয়ন

নেতৃত্বের হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠে। যার ফলশ্রুতিতে পরবর্তীতে অনেক নেতাই সে এলাকায় শ্রমিকশ্রেণীর রাজনীতি করতে এগিয়ে যান। ৭০ সালে বাওয়ানীতে সাইফুদ্দিন মানিক শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতিও নির্বাচিত হন।

ইয়াহিয়ার ঘোষণা

২৮শে নভেম্বর ১৯৭৯-প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট বাতিল করে চারটি প্রদেশের পুনরুজ্জীবন ঘটান, ১৯৭০ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে প্রকাশ্য রাজনীতি চালু ও ৫ই অক্টোবর নির্বাচনের কথা ঘোষণা করেন। পরবর্তীতে ১৯৭০ সালের ২৮শে মার্চ আইনগত কাঠামো আদেশ (L.F.O) ঘোষণা করা হয়, এতে এক লোক এক ভোট ভিত্তিতে ৩০০ জাতীয় পরিষদ সদস্যের মধ্যে ১৬২ জন পূর্ব পাকিস্তানের হবে এবং ১২০ দিনের মধ্যে সংবিধান রচনা করা গেলে জাতীয় পরিষদ বহাল থাকবে বলে বলা হয়।

সাধারণ নির্বাচনকে সামনে রেখে ছাত্র ইউনিয়ন তার বক্তব্য দেশবাসীর সামনে উপস্থিত করে। কোন দল কিংবা প্রার্থীর স্বপক্ষে নয়, বরং সাধারণ ভাবে এগার দফার পক্ষের প্রার্থীদের জয়যুক্ত করার জন্য ছাত্র ইউনিয়ন দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানায়। নিজস্ব বক্তব্য ব্যাখা করার জন্য জমায়েতের কর্মসূচীও গ্রহণ করা হয়। ১১ দফার প্রার্থীদের জয়যুক্ত করানোর জন্য ছাত্র ইউনিয়ন কর্মীরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। আওয়ামী লীগ নেতা এই নির্বাচনকে ৬ দফার গণভোট হিসেবে ঘোষণা করেন। সাধারণ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সারা পূর্ব বাংলার জনগণ বাঙালী জাতির অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ৬ দফার পক্ষে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। গণঅভ্যুত্থানের পটভূমিতে সৃষ্ট এ অবস্থা ফলে ৭ই ডিসেম্বর, ১৯৭০-পূর্বপাকিস্তানের ২টি ছাড়া সব কটি আসন আওয়ামী লীগ জয়লাভ করে সারা পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের অধিকার লাভ করে।

জলোচ্ছাস

১৯৭০ সালের ১১ই নভেম্বর স্মরণাতীত কালের সর্বনাশা জলোচ্ছ্বাসে উপকূলীয় অঞ্চল ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থায় পৌঁছে যায়। লাখ লাখ দুর্গত মানুষের পাশে শত শত ছাত্র ইউনিয়ন কর্মী সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে এগিয়ে যায়। এই কাজে ছাত্র ইউনিয়ন সংস্কৃতিসেবী সহ বিভিন্ন স্তরের লোকদেরও সংগঠিত করে কাজে নামে। দীর্ঘদিনের অক্লান্ত সেবামূলক কাজের জন্য সে এলাকায় মানুষের মনে ছাত্র ইউনিয়ন ভালোবাসার আসনে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

দ্বাদশ সম্মেলন

১৯৭০ সালের ২৮ ও ২৯শে অক্টোবর ছাত্র ইউনিয়নের দ্বাদশ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মহসীন হল মাঠের মতো খোলা স্থানে। এতবড় ছাত্র সম্মেলন ইতিপূর্বে আর অনুষ্ঠিত হয়নি। বিরাট ও জাঁকজমকপূর্ণ এই সম্মেলন ছাত্র ইউনিয়নের অতীত সংগ্রামে অবদানের স্বীকৃতিই বহন করে। নুরুল ইসলাম সভাপতি ও মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। গণ অভ্যুত্থানে ছাত্রসমাজ ও দেশবাসী যে আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটিয়েছে তা বাস্তবায়নের জন্য সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিরা শপথ গ্রহণ করেন। সে জন্য প্রকৃত জাতীয় মুক্তির লক্ষ্যে সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়াশীলদের পরাভূত করে ছাত্র সমাজ ও দেশবাসীর ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামকে এগিয়ে নেওয়ার সংকল্প ব্যক্ত করা হয়।

সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয়ের মধ্য দিয়ে প্রতিক্রিয়াশীলরা পরাজিত হলেও তাদের চক্রান্ত থেমে থাকেনি। পাকিস্তানের দীর্ঘ ইতিহাসে বাঙালীদের বিরুদ্ধে চক্রান্তের প্রতিরোধে আইয়ুব বিরোধী গণঅভ্যুত্থানের ফল নস্যাতের জন্য সামরিক আইন জারী করে স্বার্থান্বেষী মহল ভেবেছিলেন তারা পার পেয়ে যাবে। কিন্তু নির্বাচনী ফলাফল তাদেরকে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করে। আর সে জন্য ধাপে ধাপে একটি নীলনকশা বাস্তবায়নের দিকে পাকিস্তানী সামরিক-আমলাতন্ত্র এবং একচেটিয়া

পুঁজি ও সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী অগ্রসর হয়।

ডাকসু '৭০

'৭০ সালে ডাকসু নির্বাচন হয় আওয়ামী লীগের পক্ষে বিরাট জনসমর্থনের পরিস্থিতিতে। স্বাভাবিক কারণেই ছাত্র সমাজও তখন সে স্রোতধারায় অবস্থান গ্রহণ করেছিল। কিন্তু এর মধ্যেও নির্বাচনে ছাত্র ইউনিয়ন অল্প ব্যবধানে হারে ডাকসুতে। সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে ইকবাল আহমেদ সহ কয়েকজন ছাত্র ইউনিয়ন থেকে জয়ী হয়। রোকেয়া হল ও জগন্নাথ হলে অবশ্য ছাত্র ইউনিয়ন বিপুল ভোটে জয়ী হয়। গণঅভ্যুত্থান সৃষ্টিতে ছাত্র ইউনিয়নের ভূমিকা ও ক্রীড়া-সংস্কৃতি সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকার স্বীকৃতি স্বরূপই ছাত্র ইউনিয়ন জাতীয়তাবাদের এই জোয়ারের মধ্যে নিজ অবস্থান চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী প্রগতিশীল ধারা এভাবেই স্বাধীনতার আগে থেকেই ডাকসুর অবস্থান গ্রহণ নির্ধারণে সক্ষম হয়।

ইয়াহিয়ার নতুন ষড়যন্ত্র

নির্বাচনের পর ইয়াহিয়া খান কালক্ষেপনের আশ্রয় গ্রহণ করেন। জাতীয় পরিষদ অধিবেশন না ডেকে এটা ওটা করে সময় কাটানো হতে থাকে। ১২ থেকে ১৪ই জানুয়ারী ১৯৭১—ইয়াহিয়ার ঢাকা অবস্থান কালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সাথে সাক্ষাৎ হয় ও তাঁকে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী বলে ঘোষণা করা হয়। এরপর পিণ্ডীতেও বৈঠক হয়। ইয়াহিয়া-ভুট্টো, মুজিব-ভুট্টো বৈঠক হয়। অনেক তালবাহানার পর ইয়াহিয়া খান ১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ঘোষণা করেন যে, ৩রা মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ঢাকায় বসবে। পরবর্তী পর্যায়ে ভুট্টো অধিবেশনে যোগ না দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। ১লা মার্চ অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করা হয়। এটা তখন পরিষ্কার হয়ে যায় যে ভোটের রায় বানচালের চক্রান্ত চলছে।

জরুরী বার্তাক্ষণ

জনগণের রায়ের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের সামরিক স্বৈরতন্ত্রের চক্রান্ত সম্পর্কে ছাত্র ইউনিয়ন প্রথম থেকেই সজাগ ছিল। এই ষড়যন্ত্র প্রতিহত করার জন্য প্রয়োজন জনতার প্রতিরোধ গড়ে তোলা। এই লক্ষ্য থেকে ছাত্র ইউনিয়ন ১৪ই ফেব্রুয়ারী মধুর কেন্টিনে বিশেষ জরুরী কাউন্সিল অধিবেশন আহবান করে। পাকিস্তানের প্রতিটি ভাষাভাষী জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ও বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার দিতে হবে এই সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে ঐ কাউন্সিল এক ঐতিহাসিক কর্ম সমাধা করে যা ছিল আসলে স্বাধীনতারই নামান্তর। তখনকার পরিস্থিতিতে ছাত্র সমাজ ও দেশবাসীর কাছে এক বিরাট অনুপ্রেরণার বিষয় ছিল এ সিদ্ধান্ত। এই বক্তব্যের আলোকে দেশ-বিদেশে জনমত গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয় ছাত্র ইউনিয়ন নেতৃত্ব।

আন্তর্জাতিক ছাত্র সম্মেলনে যোগদান

ফেব্রুয়ারী মাসে আন্তর্জাতিক ছাত্র ইউনিয়নের দশম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় চেকোস্লাভাকিয়ার ব্রাতিশ্লাভা শহরে। এই সম্মেলনে তৎকালীন ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি জনাব নুরুল ইসলাম যোগদান করে এখানকার সত্যি-কারের চিত্র তুলে ধরেন। বাংলাদেশের কোন ছাত্র প্রতিনিধির পক্ষে '৬০ এর পর আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদান ছিল এটিই প্রথম। এর পূর্বে কয়েকবার আমন্ত্রণ সত্ত্বেও সংগঠনের কোন প্রতিনিধি যোগ দিতে পারেন না। সরকারী অনুমতির অভাবই এর কারণ। এবার আন্দোলনের পটভূমিতে সরকারের অনুমতি না দিয়ে কোন উপায় ছিল না। ছাত্র ইউনিয়ন কার্যকরী পরিষদে নির্বাচিত হয়। আন্তর্জাতিক ফোরামে তৎকালীন পূর্ব বাংলার বাস্তব অবস্থা তুলে ধরার কারণে পরবর্তী সময়ে স্বাধীনতার স্বপক্ষে আন্তর্জাতিক সমর্থন লাভ সহজতর হয়েছিল। সম্মেলনে বাংলাদেশের ছাত্র জনতার সংগ্রামের সাথে সংহতি ঘোষণা করে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

প্রচার-সমাবেশ-সংগ্রাম

বিশেষ কাউন্সিল সভার পর সারা দেশে ছাত্র ইউনিয়ন তার বক্তব্য

প্রচার করতে থাকে। ২২শে ফেব্রুয়ারী শহীদ মিনারের সমাবেশে ছাত্র ইউনিয়ন ঘোষণা করে, ৩রা মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসবে—নইলে বাংলা স্বাধীন হবে। '৭১ এর ২৮শে ফেব্রুয়ারী ছাত্র ইউনিয়ন ও ন্যাপ এর যৌথ জনসভায়ও উল্লিখিত শ্লোগান উচ্চারণ করা হয়। কারণ একথা তখন পরিস্কার হয়ে গিয়েছিল যে, নতুন করে তালবাহানার জবাব একটাই—স্বাধীনতার প্রস্তুতি।

৩রা মার্চের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণার পরপরই সারাদেশ স্বতস্ফূর্তভাবে গর্জে ওঠে। দুপুর ১টা ৫ মিনিটে বেতারে এই ঘোষণার সাথে সাথেই ঢাকাসহ সারাদেশে প্রতিবাদী মানুষের ঢল নামে। ২রা মার্চ ঢাকায় ও ৩রা মার্চ সারা দেশে হরতাল আহবান করা হয়। ছাত্র ইউনিয়ন জনতার স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধকে স্বাধীনতার লক্ষ্যে পরিচালিত করতে সচেষ্ট হয়। ২রা মার্চ পল্টন ময়দানে ন্যাপ ও ছাত্র ইউনিয়নের যৌথ জনসভায় চূড়ান্ত সংগ্রামের প্রস্তুতি নেয়ার জন্য জনগণকে আহবান জানানো হয়।

৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' বলে যে ঐতিহাসিক ঘোষণা দেন তাতে কার্যত বাঙালী জনগণের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার কথাই প্রতিধ্বনিত হয়। সারা দেশে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়—ফলে পূর্ব বাংলায় ইয়াহিয়া চক্রের নেতৃত্বের অবসান রচিত হয়। অফিস-আদালতে, স্কুল-কলেজ সহ সর্বত্র সংগ্রামী জনতার মহা জাগরণে স্বাধীনতা সংগ্রামের পদধ্বনি সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। ২রা মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করা হয়। কারফিউ ভেঙ্গে হাজার কণ্ঠের বজ্রনিনাদের ফলে সামরিক সরকার কারফিউ তুলে নিতে বাধ্য হয়।

অসহযোগ আন্দোলন

ছাত্র ইউনিয়ন এই সময়ে কতগুলো বাস্তব পদক্ষেপ পরিকল্পিত উপায়ে গ্রহণ করে যা স্বাধীনতার জন্য অপরিহার্য ছিল। ৮ই মার্চ থেকে ২৪শে মার্চ

পর্যন্ত প্রতিদিন শহীদ মিনারে জনসভা করে সম্ভাব্য করণীয় সম্পর্কে বক্তব্য উপস্থাপনের সাথে সাথে দেশপ্রেমিক শক্তির ঐক্যের গুরুত্ব, সম্ভাব্য আক্রমণের প্রতিরোধের প্রস্তুতি, এলাকায় গণ কমিটি গঠন, সাম্রাজ্যবাদের ভূমিকা, আমাদের শত্রু-মিত্র ইত্যাদি বিষয়ে বক্তব্য উত্থাপন করতে থাকে। কিন্তু একথা দুঃখজনক হলেও সত্য যে দেশপ্রেমিক শক্তির কার্যকর ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এমন কি ছাত্র সমাজের ঐক্যও প্রতিষ্ঠা করা যায়নি। ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে এককভাবে 'স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। এটা না করে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করলে ছাত্র সমাজ আরও বেশি কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারত।

সশস্ত্র প্রশিক্ষণ

অবস্থা যে পর্যায়ে অগ্রসর হয়ে যাচ্ছিল, তাতে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠছিল যে দেশ সশস্ত্র সংগ্রামের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এই বিবেচনা থেকে ছাত্র ইউনিয়ন রাইফেল দিয়ে সশস্ত্র সংগ্রামের প্রশিক্ষণ দেয়া শুরু করে। অবশ্য বোধগম্য কারণে এগুলি ছিল ড্যামী রাইফেল। প্রতিদিন সকালে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে সমবেত হয়ে এই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতো। এই প্রশিক্ষণ দেখার জন্য প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ জমায়েত হতো। সারাদেশে ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে এই ধরনের প্রশিক্ষণ শুরু হয়। ২৩শে মার্চ ঢাকা শহরে অনুষ্ঠিত হয় রাইফেল সহ রুট মার্চ। রাস্তার দু'পাশে লক্ষ মানুষ এই দৃশ্য অবলোকন করে এবং সারা শহরে এই ঘটনা বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করে। ছাত্র ইউনিয়নের প্রচেষ্টা সফল হয়। মানুষের মধ্যে সাহস, উৎসাহ ও ভবিষ্যতের কঠিন সংগ্রামের প্রেরণা সৃষ্টি করাই ছিল এই কাজের লক্ষ্য। স্বাধীনতার সংগ্রাম সশস্ত্র রূপ নিতে পারে এই লক্ষ্য নিয়ে মানুষ মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকুক ছাত্র ইউনিয়নের এই চিন্তা পুরোপুরি সফল হয়ে যায়।

২৫শে মার্চ

২৫শে মার্চ ভোরে গোপনে খবর পাওয়া যায় যে রাতে পাক বাহিনীর

বর্বর আক্রমণ পরিচালিত হতে পারে। এ সম্পর্কে জনগণকে সজাগ করে দেয়ার জন্য ছাত্র ইউনিয়ন উদ্যোগ গ্রহণ করে। মাইকযোগে শহরে এই কথা প্রচার করা হয়। ছাত্র ইউনিয়ন কর্মীরা পথসভা, খণ্ডমিছিল করে রাস্তার মোড়ে মোড়ে ও পাড়ায় পাড়ায় এ খবর জানাতে চেষ্টা করে। বিকেলে শহীদ মিনারের জনসভায়ও এ সম্পর্কে বলা হয়। ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের হলগুলোতে কাউকে না থাকতে পরামর্শ দেয়া হয়।

২৫ শে মার্চের কালো রাত। বর্বর বাহিনীর পৈচাশিক থাবার আঘাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অসংখ্য ছাত্র, শিক্ষক, কর্মচারীর সাথে শহীদ হন ছাত্র ইউনিয়নের স্বশীল, গণপতি ও এস, এম, হলের লুৎফুল আজীম। সুখে দুঃখে ছাত্রদের সাথে থাকতে হবে—এই চিন্তা থেকেই তারা সেদিন হল ছেড়ে যাননি। ২৫ শে মার্চের কালোরাতের উদ্যত সঙ্গীনের মুখেও ছাত্র ইউনিয়ন কর্মীরা আপন দায়িত্ব পালনে পিছপা হয়নি।

২৭ শে মার্চ কারফিউ শিথিল করা হলে ছাত্র ইউনিয়ন নেতৃত্ব ঢাকা শহরে কর্মীদের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করে। আগে থেকে ঠিক করা যোগাযোগ কেন্দ্র ঢাকা মেডিক্যালের আউটডোরে অনেকের সাথে যোগা-যোগ হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে গিয়ে অবস্থা দেখা, বিভিন্ন এলাকার খোঁজ-খবর করার মতো কঠিন দায়িত্বও সে সময় ছাত্র ইউনিয়ন নেতা ও কর্মীরা পালন করে। বিধ্বস্ত ঢাকা শহরের জ্বলন্ত গহ্বর থেকে মানুষ তখন ছুটে চলেছে শহরতলী হয়ে গ্রামের দিকে। হাজার হাজার মানুষের কাফেলার সাথে ছাত্র ইউনিয়ন কর্মীরাও অগ্রসর হয় পরবর্তী করণীয় করার জন্য। সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়ে ছাত্র ইউনিয়ন অগ্রসর হয় দেশমাতৃকার মুক্তির মিছিলে।

২৫শে মার্চের পর সারাদেশে প্রতিরোধ সংগ্রামের সুচনা হয়। বাঙ্গালী সৈনিক-পুলিশ সহ সর্বস্তরের মানুষ এতে যুক্ত হয়। ছাত্র ইউনিয়ন কর্মীরাও পূর্ণ উদ্যমে এতে অংশ গ্রহণ করে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে পাক বাহিনী তাদের আগ্রাসী থাবা দিকে দিকে বিস্তারিত করতে থাকে। শহর-বন্দর-গ্রাম

ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে থাকে। অবাধ হত্যা-ধর্ষণ নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হয়। স্বাভাবিক কারণেই সশস্ত্র প্রস্তুতির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। লাখ লাখ দেশপ্রেমিকের মতো ছাত্র ইউনিয়ন মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণের মানসে অগ্রসর হয়।

স্বাধীন সরকার

১৭ই এপ্রিল স্বাধীন বাংলা সরকার শপথ গ্রহণ করে। এই সময়ে স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রও চালু হয়। এই সব ঘটনা নির্যাতিত মানুষের মধ্যে বিপুল উৎসাহ ও প্রেরণার সৃষ্টি করে। ২২ শে এপ্রিল ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নবগঠিত সরকারকে স্বাগত জানিয়ে বিবৃতি প্রচার করেন এবং ছাত্রজনতাকে নিজ নিজ শক্তি নিয়ে লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানান। দেশে এবং বিদেশে এই বিবৃতি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে।

সশস্ত্র সংগ্রাম

স্বাধীনতার এই প্রত্যক্ষ যুদ্ধকে সামনে রেখে ছাত্র ইউনিয়ন কতগুলো সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। সাধারণ ছাত্র ও তরুণদের ট্রেনিং গ্রহণ করে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার জন্য ব্যাপকভাবে উদ্বুদ্ধ করার কর্মসূচী গ্রহণ করে ছাত্র ইউনিয়ন। এই লক্ষ্যে ছাত্র তরুণদের সংগঠিত করার কাজ চলতে থাকে। ছাত্র ইউনিয়ন সংগঠনের কর্মীদেরও এক্ষেত্রে পাঠানো হয়। স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের নিয়ন্ত্রিত নিয়মিত ও গেরিলা বাহিনীতে যোগ দেয়ার পাশাপাশি ছাত্র ইউনিয়ন কমিউনিস্ট পার্টি ও ন্যাপের সাথে যৌথভাবে একটি বিশেষ গেরিলা বাহিনী গঠন করে। দেশমাতৃকাকে শত্রু-মুক্ত করার কাজে এ বাহিনী এক সংগ্রামী দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। কুমিল্লার বেতিয়ারায় ১১ই নভেম্বর এক সম্মুখ সমরে ছাত্র ইউনিয়ন নেতা নিজামুদ্দিন আজাদ, সিরাজুম মুনীরসহ অনেকেই শহীদ হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। হাজার হাজার মুক্তি সেনানীর গেরিলা বাহিনী গঠন করার পাশাপাশি শত্রু দখলীকৃত অঞ্চলে ছাত্র ইউনিয়ন কতগুলো গোপন সংগঠন গড়ে

তোলে। এ সংগঠন বিভিন্ন খবর সংগ্রহ করা, মুক্তি যোদ্ধাদের জন্য আশ্রয়স্থল বের করাসহ বহু গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব পালন করে।

ঐক্যের প্রচেষ্টা

স্বাধীনতার পক্ষের সকল শক্তির মধ্যে সমঝোতা গড়ে তোলার জন্য ছাত্র ইউনিয়ন প্রথম থেকেই বক্তব্য তুলে ধরে। স্বাধীনতা সংগ্রামকে জোরদার করা এবং কার্যকরভাবে অগ্রসর করানোর জন্য সকল দেশপ্রেমিক শক্তির ঐক্য ছিল অপরিহার্য। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, এর গুরুত্ব অনেকেই উপলব্ধি করেননি। অবশেষে আওয়ামী লীগ, দুই ন্যাপ, কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দকে নিয়ে একটি পরামর্শদাতা কমিটি গঠিত হয়— যার দ্বারা জনতার মধ্যে অনুপ্রেরণার গতিবেগ দ্রুততর হলেও এই কমিটির কার্যকরী ক্ষমতা বিশেষ ছিল না, যা থাকার প্রয়োজন ছিল অতি জরুরী। ছাত্র সমাজের মধ্যে বৃহত্তর ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্যও ছাত্র ইউনিয়ন প্রচেষ্টা চালায়। কিন্তু ছাত্র লীগের একলা চলার সংকীর্ণ নীতি এ ক্ষেত্রে বাঁধার সৃষ্টি করে। অবশেষে ছাত্র ইউনিয়নের অক্লান্ত পরিশ্রমের বিনিময়ে নভেম্বর মাসে ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্র লীগের একটি যুক্ত বিবৃতি প্রকাশিত হয় মাত্র। যদি এ কাজ আগে করা যেতো এবং কার্যকর ঐক্য স্থাপিত হতো তাহলে মুক্তিযুদ্ধে ছাত্র তরুণদের অংশগ্রহণ আরও পরিকল্পিতভাবে করা সম্ভব হতো।

আন্তর্জাতিক প্রচার

স্বদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে বিশ্বব্যাপী পরিচিত করানো এবং আন্তর্জাতিক সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে ছাত্র ইউনিয়ন বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করে। মে মাসে ছাত্র ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ এক বিরাট সাংবাদিক সম্মেলন করে বিশ্ববাসীর কাছে সকল ঘটনার বাস্তব চিত্র তুলে ধরে। এই বক্তব্য বিভিন্ন দেশে প্রচারিত হয় এবং বিভিন্ন দেশের মানুষ ছাত্র ইউনিয়নের মাধ্যমে প্রকৃত ঘটনার সম্পর্কে জানতে পারে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ছাত্র ও যুব সংগঠনগুলোর কাছে ছাত্র ইউনিয়ন একটি বক্তব্যসহ আবেদন প্রেরণ

করে। যার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন দেশে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে প্রচার চলে এবং বিভিন্ন দেশ থেকে সমর্থন আসতে থাকে। সেই বিপদের দিনগুলোতে এই সমর্থনবাণীও বিরাট উৎসাহ উদ্দীপনার সঞ্চার করতে সক্ষম হয়।

মুক্তিযুদ্ধের সেই কষ্টকর দিনগুলোতেও ছাত্র ইউনিয়ন ছাত্র জনতার সামনে সঠিক বক্তব্য তুলে ধরতে প্রয়াসী হয়। আমাদের স্বাধীনতার প্রত্যক্ষ শত্রু পাকিস্তানের সহযোগী সাম্রাজ্যবাদ ও চীনের ভ্রান্ত নেতৃত্বের সরূপ দেশবাসীর সামনে তুলে ধরা হয়। পক্ষান্তরে মিত্র শক্তি ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়নসহ গোটা বিশ্বের গণতান্ত্রিক-প্রগতিশীল শক্তির ভূমিকা সম্পর্কেও পরিষ্কার বক্তব্য তুলে ধরা হয়। সাম্রাজ্যবাদসহ গোটা শত্রু শিবিরের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে মিত্রদের সহযোগিতা নিয়ে দেশ স্বাধীন করার কঠিন দায়িত্বের কথা ছাত্র ইউনিয়ন বিভিন্নভাবে ছাত্র জনতার কাছে তুলে ধরে।

মানুষের প্রিয়তম সম্পদ হচ্ছে জীবন, সে জীবনকে বাজী রেখে ছাত্র ইউনিয়ন তার সাধ্য অনুযায়ী মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। যে স্বপ্ন যে আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ১৯ বছর পূর্বে জন্ম হয়েছিল তা বাস্তবায়নের জন্য ছাত্র ইউনিয়নের কর্মীরা অকুতোভয়ে অগ্রসর হয়। ছাত্র ইউনিয়ন কর্মীসহ লাখ লাখ মুক্তিযোদ্ধার আত্মহুতি, লাখ লাখ মা বোন ও দেশবাসীর নির্যাতন-এর বিনিময়ে অবশেষে ১৯৭১-এর ১৬ই ডিসেম্বর অর্জিত হয় মহা বিজয়। মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় মিত্র বাহিনীর কাছে আত্ম সমর্পণ করে পাকিস্তান হানাদার বাহিনী ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে। সে মহা উল্লাসে আনন্দঘন মুহূর্তের অব্যবহিত পরে ছাত্র ইউনিয়নের মুক্তিযোদ্ধারা বিধ্বস্ত শহীদ মিনারে শপথ গ্রহণ করে। ১৯৫২ সালের জন্মকালীন ঘোষণার এক ধাপ বাস্তবায়িত হয়েছে সত্য, কিন্তু সামনে আছে আরেক ধাপ। সে ধাপ বাস্তবায়নের শপথে বলীয়ান হয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের হাতের উদ্যত বন্দুক থেকে বের হয়ে যায় ঝাঁক ঝাঁক গুলির বজ্রনিনাদ--গুলির সে নিনাদে ধ্বনিত হয় অতীত বর্তমানের সংগ্রামী উত্তরাধিকার।

চার

দেশ গড়ার সংগ্রাম

১৯৭১ সালের ২৫শে ডিসেম্বর। আমেরিকা-চীনের সাহায্যপ্রাপ্ত পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পনের পর ৯ দিন কেটে গেছে। প্রিয়জন হারানোর ব্যথা, বিধ্বস্ত বাস্তভিটায় ফিরে আসা মানুষের উপস্থিতিতে একটা স্বস্থির ভাব চারদিকে। দেশ ছাড়া, বাড়ি-ঘর ছাড়া মানুষ ফিরে আসছে—চোখে মুখে নতুন জীবনের সোনালী আশার ঝিলিক। স্কুল-কলেজ বন্ধ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজাও খোলা হয়নি। যে ছাত্র তরুণরা স্বাধীনতার জন্য লড়েছে দীর্ঘ ৯ মাস অস্ত্র হাতে তাদের অগ্রবাহিনী বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ সমবেত হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান সংলগ্ন ভবনে। বিকেল ঠিক ৪ টায় দেশী-বিদেশী সাংবাদিকদের সামনে উঠে দাঁড়ালেন তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম।

যুগ যুগ ধরে পরাধীন একটি জাতি স্বাধীনতা অর্জন করেছে। পরাধীনতার জের হিসেবে কৃষি-শিল্প সহ সামগ্রীক উৎপাদন ব্যবস্থায় পশ্চাদপদতা, সামন্তবাদী-পুঁজিবাদী শোষণে মানুষের সীমাহীন দারিদ্র, শিক্ষার নগণ্য হার, সুস্থ সাংস্কৃতিক বিকাশে প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদির সাথে সাম্প্রতিক সময়ে পাকিস্তানী বাহিনীর বর্বর অত্যাচারে বিধ্বস্ত গোটা দেশ। এ অনগ্রসরতাজনিত ঘাটতি মিটিয়ে দ্রুত দেশকে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সেদিন মুজাহিদুল ইসলাম সেলিমের বক্তব্যে তুলে ধরা হলো ছাত্র সমাজের বিপ্লবী দায়িত্বের কথা। ক্ষতিগ্রস্থ জনগণের পুনর্বাসন, যুদ্ধের ক্ষত মুছে ফেলে দ্রুত দেশকে গড়তে হবে—কোন পথে? সমাজতন্ত্রের পথে দেশ গড়ার কথা ঘোষণা করা হয় ছাত্র ইউনিয়নের পক্ষ থেকে। বেয়নেটকে লাঙ্গলের ফলায় রূপান্তরের ঐতিহাসিক ঘোষণা দিয়ে ছাত্র ইউনিয়ন সেদিন তুলে ধরে দেশ গড়ার বিপ্লবী কর্মসূচী।

শিক্ষা ব্যবস্থার বৈপ্লবিক রূপান্তরের জন্য জনগণের দীর্ঘদিনের আকাংখিত সার্বজনীন গণমুখী ও বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষানীতি কায়েমের জন্যও এখানে দাবী উত্থাপন করা হয়।

৩১ শে ডিসেম্বর, ১৯৭১। সাংবাদিক সম্মেলনের ৫ দিন পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে ঢাকা শহরের ছাত্র ইউনিয়ন কর্মীদের এক বিরাট জমায়েত আহবান করা হয়। কয়েক হাজার ছাত্র-ছাত্রীর এই সমাবেশ থেকে গড়ে তোলা হয় ছাত্র ইউনিয়নের স্বেচ্ছাসেবক ব্রিগেড। ঢাকা শহরকে ৭টি জোনে ভাগ করে ৩৫টি গ্রুপ গঠন করা হয়। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, আশ্রয়হীন মানুষকে পুনর্বাসিত করা, জনগণের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখা, বিধ্বস্ত অঞ্চল পুনর্গঠন সহ বিবিধ ধারায় কাজ করে অস্থিতিশীল পরিস্থিতিতে শান্তি ও স্বস্থি ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে এ ব্রিগেড আন্দোলন শুরু করা হয়। ১ মাসের মধ্যে ঢাকা শহরে এ ব্রিগেডের সদস্য সংখ্যা এক হাজারের বেশি হয়ে যায় এবং ৬ মাসের মধ্যে সারা দেশে দশ হাজারের উপরে ছাত্র তরুণ এ কাজে সমবেত হয়। ধীরে ধীরে এ স্বেচ্ছাসেবকরা নিরক্ষরতা দূর করার লক্ষ্যে নৈশ বিদ্যালয় চালু করে। ঢাকা সহ সারাদেশে ছাত্র ইউনিয়নের স্বেচ্ছাসেবক ব্রিগেড মানুষের মনে শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ কাজ করতে গিয়ে অসংখ্য কর্মী কালোবাজারী মজুদদার সহ স্বার্থান্বেষী মহলের বিরাগ ভাজন হয় এবং মিথ্যা মামলা, দৈহিক নির্যাতন সহ নানাবিধ নির্যাতনের শিকার হয়। জীবনের ঝুঁকি নিয়েও হাজার হাজার ছাত্র ইউনিয়ন কর্মী বেআইনী অস্ত্রধারী সহ জনস্বার্থবিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যায় এবং নতুন ধারার আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে সচেষ্ট হয়।

অন্যান্য কাজ

স্বেচ্ছাশ্রমের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের কাজে ছাত্র ইউনিয়ন নজর দেয়। স্বাধীন দেশে একটি সুস্থ সাংস্কৃতিক ধারা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৯৭২ সালের প্রথম দিনটিতে শহীদ মিনারের মুক্ত আকাশের নীচে অনুষ্ঠিত হয়

ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। লাখো লাখো শহীদের সংগ্রামী স্মৃতিতে নিবেদিত এই অনুষ্ঠান সেদিন হাজার হাজার দর্শক দ্বারা প্রশংসিত হয়েছে। খেলাধুলার উন্নয়নের ক্ষেত্রেও ছাত্র ইউনিয়ন অবদান রাখে। ২০শে জানুয়ারী থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে বাস্কেটবল প্রশিক্ষণ চালু করা এর প্রাথমিক পদক্ষেপ।

শিক্ষানীতি প্রসঙ্গে

স্বাধীনদেশে নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য ছাত্র ইউনিয়ন প্রথম উদ্যোগ নেয়। ছাত্র ইউনিয়ন কর্তৃক গঠিত শিক্ষা কমিশন ১৭ই জানুয়ারী প্রথম সেমিনার করে। দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদগণ এখানে সুচিন্তিত মতামত রাখেন। সবার জন্য শিক্ষা ও দেশের বাস্তব প্রয়োজনে নতুন ধারার শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এই কমিশন পরবর্তীতে একটি রিপোর্ট প্রণয়ন করে ও সরকারের কাছে পেশ করে। ত্রয়োদশ সম্মেলনে এ রিপোর্ট গৃহীত হয়।

এভাবে ছাত্র ইউনিয়ন স্বাধীনতা অর্জনের পর স্বল্পতম সময়ের মধ্যে সুশৃঙ্খল ও বৈপ্লবিক চেতনা সমৃদ্ধ নতুন ধারার গঠনমূলক আন্দোলনে পারদর্শী ছাত্র সমাজ গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়। যে ছাত্রসমাজ একসময় লড়াই করেছে পাকিস্তানী স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে, স্বাধীনদেশে তারা লড়াই করবে ক্ষুধা-দারিদ্র-সামাজিক পশ্চাদপদতার বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে—এই ছিল ছাত্র ইউনিয়নের লক্ষ্য।

স্বাধীন দেশে প্রথম কেন্দ্রীয় কমিটির সভা

বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির বর্দ্ধিত সভায় (২০ ও ২১শে জানুয়ারী '৭২) স্বাধীন দেশে কর্তব্য নির্ধারণ করতে গিয়ে বলা হয়, 'শিক্ষা, সংস্কৃতি, সমাজ, অর্থনীতি তথা সমস্ত দিক থেকে আজ দেশকে মুক্ত করার লক্ষ্য নিয়ে দেশকে গড়ে তুলতে হবে।...গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে সমাজ প্রগতির পথে সকল বিরুদ্ধ শক্তিকে নির্মূল করতে হবে।' ছাত্র সমাজের গৌরবোজ্জ্বল সংগ্রামী অতীত বর্ণনা করে এই সভায় শাসনতন্ত্র প্রণয়নসহ বিভিন্ন নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে ছাত্র সমাজের বক্তব্য

থাকা প্রয়োজন বলে অভিমত ব্যক্ত করা হয়। কেন্দ্রীয় কমিটির ঐ সভা সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড পুরোদমে শুরু করার পাশাপাশি শহীদের স্বপ্নসাধ বাস্তবায়নের সংগ্রামে ছাত্র সমাজকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানায়।

জয়ধ্বনি

ছাত্র আন্দোলনকে সঠিকখাতে প্রবাহিত করার প্রয়োজনীয়তা থেকে ও বিশাল সংগঠনকে অগ্রসর করার চাহিদা পূরণের জন্য ২৪শে জানুয়ারী 'জয়ধ্বনি' নামে ছাত্র ইউনিয়নের সাপ্তাহিক মুখপত্র প্রথম প্রকাশিত হয়। তিন বছরে এই সাপ্তাহিক পত্রিকা শুধু ছাত্র ইউনিয়ন নয়, সমগ্র ছাত্র সমাজের মুখপত্রে পরিণত হয়। আমাদের দেশে কোন ছাত্র সংগঠনের সাপ্তাহিক মুখপত্র প্রকাশ এই প্রথম। প্রথমে সম্পাদকমণ্ডলীর প্রধান ছিলেন তৎকালীন কোষাধ্যক্ষ ও পরে সাধারণ সম্পাদক জনাব আবদুল কাইয়ুম মুকুল। পরবর্তীতে ১৯৭৪ সালের মার্চ মাস থেকে অজয় দাশ গুপ্ত তার স্থলাভিষিক্ত হন। ১৯৭৫ সালের ১৭ই জুন সব সংবাদপত্র নিষিদ্ধ হওয়ার পর এর প্রকাশনাও বন্ধ হয়ে যায়। দীর্ঘ তিন বছর ধরে এই পত্রিকা ছাত্র আন্দোলনে সুবিধাবাদী ধারাও উগ্র হটকারী ধারার বিরুদ্ধে নিরলস সংগ্রাম করে সুস্থ্য ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালায়।

ত্রয়োদশ সম্মেলন

স্বাধীন দেশে প্রথম ছাত্র ইউনিয়নের জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭২ সালের ৯, ১০ ও ১১ই এপ্রিল। রেসকোর্স ময়দানে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর বিশাল সমাবেশ। এতবড় ছাত্র সমাবেশ ইতিপূর্বে দেশের আর কোথাও হয়নি। ৯ তারিখের রৌদ্র করোজ্জল প্রভাতে ত্রয়োদশ সম্মেলন উদ্বোধন করলেন দেশের প্রধান মন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সম্মেলনের জমায়েত, র‍্যালী, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সব মিলিয়ে ঐ তিন দিন ঢাকা শহর পরিণত হয়েছিল ছাত্র ইউনিয়ন তথা ছাত্র সমাজের ঢাকায়। বৃহত্তম ছাত্র সমাবেশে সেদিন ধ্বনিত হয়েছিল, 'দেশের স্বাধীনতাকে সংহত করতে

হবে, মুক্তিযুদ্ধের পরাজিত এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ভূমিকা গ্রহণকারী দেশী-বিদেশী শত্রুদের অব্যাহত চক্রান্তকে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিহত করতে হবে।···শিক্ষা ব্যবস্থাকে স্বাধীন দেশের উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে।···ইতিবাচক নতুন ধারার ছাত্র আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে···'।

এই সম্মেলনে আরও ঘোষণা করা হয়, 'জনগণের মুক্তি বিপ্লবকে অগ্রসর করে নেয়ার ক্ষেত্রে বর্তমান সরকার প্রগতিশীল ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। তাই সরকারের প্রতি আমাদের নীতি সহযোগিতামূলক হবে।'

সংগঠনগতভাবেও এই সম্মেলনে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। বিভিন্ন মহকুমাকে জেলার মর্যাদা দেওয়া হয় এবং জাতীয় পরিষদ গঠনের বিধান যুক্ত করা হয়। ঘোষণাপত্র এবং গঠনতন্ত্র সংশোধন করার প্রস্তাব নেওয়া হয়, যা গৃহীত হয় পরবর্তী সম্মেলনে। এই সম্মেলনে মুজাহিদুল ইসলাম সেলিমকে সভাপতি ও আবদুল কাইয়ুম মুকুলকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়।

বিজয়ের কাফেলা

ত্রয়োদশ জাতীয় সম্মেলনের নতুন ধারায় বক্তব্য নিয়ে সারাদেশে ছাত্র ইউনিয়ন সংগঠনের ব্যাপক সাংগঠনিক তৎপরতা চালানো হয়। জেলা, থানা, স্কুল-কলেজে ব্যাপক ভিত্তিক সংগঠন গড়ে উঠে। লাখ লাখ ছাত্র-ছাত্রী সমবেত হয় ছাত্র ইউনিয়নের পতাকাতলে। ভাল ছাত্র, খেলোয়াড়, সংস্কৃতি কর্মী সহ বিভিন্ন ধারায় সমৃদ্ধ ছাত্র-ছাত্রী এখানে জমায়েত হতে থাকে। ২০শে মে ডাকসু নির্বাচনে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন জয়লাভ করে এককভাবে। সহ সভাপতি পদে নির্বাচিত হন মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম ও সাধারণ সম্পাদক হন মাহবুব জামান। এ ছাড়া অনেক হলেও জয়লাভ করে ছাত্র ইউনিয়ন। এ বছর রাকসু, চাকসু, ইউকসুসহ দেশের অধিকাংশ স্কুল-কলেজেই বিজয়ের মালা শোভা পায় ছাত্র ইউনিয়নের গলায়। এ যেন এক মহা জাগরণ—এ জাগ্রত কাফেলাকে সাথে নিয়ে ছাত্র ইউনিয়ন সংগঠন অগ্রসর হয় দেশ মাতৃকার গঠনমূলক কাজে—নতুন ধারার সংগ্রামে।

ছাত্র লীগের বিভক্তি

ডাকসু নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ছাত্র লীগ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। একদল সরকারী দল আওয়ামী লীগের সমর্থক হিসেবে থেকে যায়। অন্যদল আ.স.ম রবের অনুসারী হিসেবে কট্টর সরকার বিরোধী অবস্থান গ্রহণ করে ও পরবর্তীতে সৃষ্ট নতুন রাজনৈতিক দল জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল বা জাসদের অনুসারী হয়। ডাকসু নির্বাচনের পূর্বে জয়ধ্বনির বিশেষ সংখ্যায় এ সম্পর্কে বলা হয়, 'সামান্য নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সহযোগী ছাত্র সংগঠন যে মর্মান্তিকভাবে ধরাশায়ী হলো আমরা এ ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ না করে পারি না। বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন চায় না যে ছাত্র সমাজের মধ্যে বিভেদ আর হানাহানি চলতে থাকুক।' দুই গ্রুপ পরস্পরকে গালাগালি করার মধ্য দিয়ে প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতা, সমাজ প্রগতি ইত্যাদির উপরই আঘাত করে চলে। এই পদক্ষেপের অশুভ দিকের উপর মন্তব্য করতে গিয়ে ঐ সংখ্যা জয়ধ্বনিতে বলা হয়, সব দেশেই সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের চক্রান্ত কার্যকরী করার জন্য একটা নীতি অনুসরণ করে থাকে—তা হচ্ছে দেশপ্রেমিক শক্তিগুলোর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা ও প্রতিক্রিয়ার শক্তিকে সুযোগ করে দেয়া…আজ ছাত্র লীগের মধ্যে বিভেদ নিঃসন্দেহে প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্তকারীদেরই সুযোগ করে দিচ্ছে।'

আওয়ামী লীগ পন্থী ছাত্র লীগের মূল কথা 'মুজিববাদ'—রাষ্ট্রীয় চার নীতির বাস্তবায়ন। এই নীতির ভিত্তিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ও রববাদীদের বিরোধীতা করতে গিয়ে তারা সমাজতন্ত্র সম্পর্কেই বিভ্রান্তি সৃঠি করে। কার্যতঃ সমাজতন্ত্রের পক্ষে ক্ষতিকর বক্তব্য প্রচার করে। যেমন একটি প্রচার ছিল, 'রাশিয়া সহ সমাজতান্ত্রিক দেশে গণতন্ত্র নেই—আমাদের দেশে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রকে মিলানো হবে যা দুনিয়ায় আর হয় নাই।' এই প্রচারের দ্বারা কার্যত সমাজতান্ত্রিক সমাজের গণতন্ত্রের সর্বোচ্চ বিকাশকেই অস্বীকার করা হয়।

অপর পক্ষ 'মুজিব বাদ'কে প্রতিহত করার জন্য শ্রেণী সংগ্রামের কথা বলেন। এবং এক্ষেত্রে স্বাধীনতার মুল্যবোধের সাথে তাদের বক্তব্য ফাঁরাক

সৃষ্টি করতে থাকে। সশস্ত্র প্রতিরোধের বক্তব্যও তারা আমদানী করে। এর ফলে বিভেদ রক্তাক্ত রূপ নেওয়ার অবস্থা সৃষ্টি হতে থাকে।

শিক্ষা আন্দোলন

স্বাধীনতার পর শিক্ষা সমস্যা গগণ চুম্বী হয়। পাকিস্তানী আমলের সিলেবাস বাতিল করে নতুন পাঠ্যসূচী প্রণয়ন ও নতুন বই সরবরাহ করা জরুরী হয়ে পড়ে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্র অনুপাতে স্কুল-কলেজ অনেক কম হওয়ায় ভর্তি সমস্যা বিশেষ প্রকট হয়ে উঠে। এই বিষয়ে দুটি জরুরী দাবী সহ মোট ২৪ দফার ভিত্তিতে ১৯৭২ সালের জুলাই মাস থেকে শিক্ষা আন্দোলন শুরু করা হয়। ছাত্র লীগের বিভক্ত অংশগুলোকে ঐক্যের পতাকায় সমবেত করা সম্ভব হয়নি। ডাকসু ও ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগেই এ আন্দোলন চলতে থাকে। স্কুল-কলেজে ছাত্র সভা, মিছিল ইত্যাদির মধ্যদিয়ে সারাদেশে ব্যাপক ছাত্র সমাবেশ করা হয় এবং জুলাই ও আগস্ট মাসে দুবার দেশব্যাপী ছাত্র ধর্মঘট পালন করা হয়। সেপ্টেম্বর মাসে এই দাবীর সাথে জনজীবনের জরুরী দাবীসমূহ যোগ করে দেশব্যাপী দাবী দিবস পালন করা হয়। কয়েকবার শিক্ষা মন্ত্রণালয় ঘেরাও করা হয় এবং শিক্ষা কতৃপক্ষকে দাবী মেনে নেয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করা হয়। হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর ঘেরাও আন্দোলন, লক্ষ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীর সমাবেশের ফলে শেষ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ মুল দুটি দাবী সহ অনেকগুলো দাবী মেনে নেন। সারাদেশে ছাত্র ইউনিয়ন এর সংগ্রামী পতাকা আরও দৃঢ়তর হয়।

নকল বিরোধী অভিযান

উচ্ছৃঙ্খলতা ও সমাজ বিরোধী কার্যকলাপের প্রভাব সাধারণ ছাত্রদের মধ্যেও পড়ে। পরীক্ষায় নকল করা একটি গণ ব্যাধিতে পরিণত হয়। বই-খাতা দেখে প্রকাশ্যে পরীক্ষার খাতায় লেখা যেন কোন অপরাধই নয়। পরীক্ষার হলে গার্ড আছে, বাইরে পুলিশ আছে, অথচ কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। কার পরীক্ষা কে দেয় তার কোন হিসেব নেই। ১৯৭২ সালে এস. এস. সি

ও এইচ. এস. সি সহ বিভিন্ন পরীক্ষায় এই নকল হয়। বিভিন্ন সংগঠন এই সুবিধাবাদী স্রোতে গা ভাসিয়ে দিলেও ছাত্র ইউনিয়ন এই ক্ষেত্রে কঠোর ভূমিকা গ্রহণ করে। সংগঠনের কর্মীদের উপর এই অসৎ পথ থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দেয়া হয় এবং সাংগঠনিক ক্ষতি স্বীকার করেও এই প্রবণতার বিরুদ্ধে প্রচার আন্দোলন চালানো হয়। নকল প্রবণতা ও বিনা পরীক্ষায় ডিগ্রী লাভের দাবীর বিরুদ্ধে পরিচালিত আন্দোলন জয়যুক্ত হয় ১৯৭৩ সালে। এর জন্য ডাকসু অফিস তছনছ করা হয়। আন্দোলনের ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও কন্‌ট্রোলার অপসারিত হন এবং সারাদেশে প্রতিরোধ গড়ে ওঠে ও গণ নকল বন্ধ হয়।

সংবিধান প্রশ্নে

১৯৭২ সালের অক্টোবরে সংবিধানের খসড়া প্রকাশ করা হয়। তাড়াতাড়ি সংবিধান প্রকাশ করে সাংবিধানিক পদ্ধতিতে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কায়েম করার জন্য ইতিপূর্বে ছাত্র ইউনিয়ন থেকে দাবী উত্থাপন করা হয়েছিল। সংবিধান প্রকাশের পর ছাত্র ইউনিয়ন থেকে ঐ সংবিধানকে গণতান্ত্রিক বলে অভিহিত করা হয় এবং সংবিধানকে গণস্বার্থে আরও উন্নত করার জন্য ১৬টি সংশোধনী উত্থাপন করা হয়। ১৯ শে অক্টোবর কেন্দ্রীয় জমায়েত ও মিছিল করে গণপরিষদে এই সব সংশোধনী পেশ করা হয়। ১৪ বছর পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা, খাদ্য-শিক্ষা-চিকিৎসা ইত্যাদি মৌলিক চাহিদাগুলোর ভিত্তিতে মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত এই সংবিধানকে অন্তবর্তীকালীন সংবিধান হিসেবে ঘোষণা করা—এসব দাবী ছাত্র ইউনিয়নের পক্ষ থেকে করা হয় এবং আইনমন্ত্রীর সাথেও বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

ভিয়েতনাম সংহতি দিবস

এ সময়ে ছাত্র ইউনিয়নের ইতিহাসে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। আন্তর্জাতিক বিপ্লবী আন্দোলনের সাথে ছাত্র ইউনিয়ন বরাবরই সংহতি প্রকাশ করে আসছে। ভিয়েতনামে মার্কিন বোমা বর্ষণের প্রতিবাদে

ডাকসু ও ছাত্র ইউনিয়ন থেকে কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। ২২শে ডিসেম্বর বিক্ষোভ অনুষ্ঠান, ২৩শে ডিসেম্বর বিশ্বগ্রন্থ মেলায় মার্কিন স্টল ভস্মীভূত করে ভিয়েতনামী স্টল স্থাপন, ২৪শে ডিসেম্বর আলোচনা সভা করার পর ১লা জানুয়ারী, ১৯৭৩ দেশব্যাপী ভিয়েতনাম সংহতি দিবস পালনের আহ্বান জানানো হয়। এই সময়েই অবশ্য ময়মনসিংহে ও রাজশাহীতে মার্কিন তথ্য কেন্দ্রে অগ্নি সংযোগ করা হয়। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৯৯ বছরের জন্য লীজ নেয়া এলাকা থেকে সন্দেহজনক মার্কিনীদের বিতারণ, চট্টগ্রামে মার্কিন তথ্যকেন্দ্রে ভিয়েতনাম কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। ১লা জানুয়ারী সংহতি দিবসের প্রাক্কালে বাংলাদেশে মার্কিন প্রচার কেন্দ্র বন্ধ, দক্ষিণ ভিয়েতনামী অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারকে স্বীকৃতি সহ কিছু দাবী উত্থাপন করা হয়।

১লা জানুয়ারী বটতলা থেকে মিছিল মতিঝিল যাওয়ার সময় তোপখানা রোডে মার্কিন তথ্যকেন্দ্রের সামনে অবস্থানরত পুলিশ কোন সতর্কতা প্রদান ছাড়াই নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করে। ছাত্র ইউনিয়ন নেতা মির্জা কাদের ও মতিউল ইসলাম শহীদ হন এবং ৬ জন বুলেটবিদ্ধ হয়ে আহত হন। এর প্রতিবাদে ২রা জানুয়ারী হরতাল পালিত হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এই হরতাল সমর্থন করে। ২রা জানুয়ারী পল্টনের জনসভায় ৭ দফা উত্থাপন করা হয় এবং তোপখানা রোডে ভিয়েতনাম সংহতি স্তম্ভের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়।

আওয়ামী লীগ-ছাত্রলীগ থেকে তখন ছাত্র ইউনিয়ন, ন্যাপ সহ প্রগতি-শীলদের অফিসে হামলা, দৈহিক নির্যাতন ইত্যাদি শুরু করে। 'বঙ্গবন্ধুকে অবমাননা করা হয়েছে'—এই অজুহাতে তারা ছাত্র ইউনিয়নসহ স্বাধিনতার সৈনিকদের উপর হামলা অব্যাহত রাখে। এই অবস্থা মোকাবেলা করার জন্য ছাত্র ইউনিয়ন যে উদ্যোগ গ্রহণ করে তা চতুর্দ্দশ সম্মেলনের রিপোর্ট অনুসারে নিম্নরূপ :

'স্বাধীনতা-প্রগতি বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল চীন মার্কিন এজেন্টদের চক্রান্ত রোধ করার জন্য, গুণ্ডাবাজী বন্ধ করার জন্য, ছাত্র-জনগণের মধ্যে

ভয়-ভীতি দূর করার জন্য আমরা পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার আহ্বান জানাই। সরকার ও শাসকদল এই আহ্বানের তাৎপর্য কিছুটা উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধুর সাথে আমাদের আলোচনা হয় এবং পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হয়।' এই ত্যাগের বিনিময়ে পরবর্তীতে দক্ষিণ ভিয়েতনামের বিপ্লবী সরকারকে স্বীকৃতিসহ কতগুলো দাবীর বাস্তবায়ন হয়।

প্রথম সাধারণ নির্বাচন

১৯৭৩ সালের ৭ই মার্চ বাংলাদেশে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৭২ সালের ১৪ই ডিসেম্বর গণপরিষদে গৃহীত সংবিধান অনুসারে অনুষ্ঠিত এই নির্বাচনে ছাত্র ইউনিয়ন প্রতিক্রিয়াশীল, স্বাধীনতা ও প্রগতি বিরোধী শক্তিকে পরাজিত করে প্রগতিশীল দেশপ্রেমিকদের পক্ষে কাজ করার জন্য ছাত্র সমাজকে আহবান জানায়। নির্বাচনে শাসকদল আওয়ামী লীগ ৩০০টির মধ্যে ২৯৩টি আসন লাভ করে। শাসক দল নির্বাচনে কিছু জোর জবরদস্তি ও কারচুপির আশ্রয় গ্রহণ করে। এটা না করলেও ঐ দল সংখ্যাগরিষ্ঠ হতো—এতে কোন সন্দেহ নেই। এই নির্বাচনের পরদিন গোপালগঞ্জের কমিউনিস্ট নেতা ওয়ালিউর রহমান লেবু, ন্যাপ নেতা কমলেশ বেদজ্ঞ, ছাত্র ইউনিয়ন নেতা বিষ্ণুপদ ও মানিক আওয়ামী লীগ আশ্রিত দুষ্কৃতকারীদের দ্বারা নিহত হন।

সংগ্রাম পরিষদ

নির্বাচনে আওয়ামী লীগের একক বিজয়ের পর দেশব্যাপী ৭০ সালের মতো উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা গেলনা। কারণ দেশজুড়ে তখন চলছে অর্থনৈতিক সংকট সহ সামগ্রিক সংকট। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, আইন-শৃঙ্খলার মারাত্মক অবনতি—হাইজ্যাক, চুরি, ডাকাতি, খুন নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হয়। ভারত সোভিয়েত বিরোধী প্রচারণায় মাঠ তখন সরগরম। প্রশাসন যন্ত্র বিকল হয়ে যায়—শাসকদলেও প্রতিক্রিয়ার দৌরাত্ম অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেতে থাকে।

এই অবস্থায় ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্র লীগের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচী নেওয়ার ব্যাপারে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। মার্চ মাসে দুই সংগঠনের পক্ষ থেকে একটি যৌথ বিবৃতি প্রচার করা হয় ও এপ্রিল মাসে পরীক্ষায় নকল বিরোধী প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়। শিক্ষানীতি বিষয়ে দুই সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয় এবং 'শিক্ষানীতি প্রসঙ্গে ছাত্র সমাজের অভিমত' নাম দিয়ে একটি পুস্তিকা প্রণয়ন করা হয়। মে মাসে দুই সংগঠনের মধ্যে আনুষ্ঠানিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কেন্দ্রীয়ভাবে ৩ জন করে ৬জন সদস্য নিয়ে কেন্দ্রীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। জেলা পর্যায়েও পরবর্তীতে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে উঠে। অর্থনীতিকে গড়ে তোলা, গঠনমূলক কাজ, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, দুর্নীতি, স্বজন-প্রীতি, সমাজ বিরোধীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ দাড় করানো, স্বাধীনতা বিরোধীদের চক্রান্ত প্রতিহত করা, সমাজতন্ত্রের সংগ্রামে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে দশ দফা কর্মসূচী প্রণীত হয়। দশ দফার ভিত্তিতে সরকারের প্রগতিশীল কর্মসূচী বাস্তবায়নে সহযোগিতা, ছাত্র তরুণদের গঠনমূলক কাজে নিয়োজিত করা এবং স্বাধীনতা ও প্রগতি বিরোধীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু হয়। জুন মাসে গ্রীষ্মকালীন ছুটির সময়ে দুই সংগঠন থেকে ছোট ছোট টিম করে শিল্পাঞ্চল ও গ্রামে পাঠানো হয়। বিভিন্ন জেলা থেকেও টিম গঠন করে অনুরূপ কাজে পাঠানো হয়।

দশ দফার ঐক্যের পরবর্তী পর্যায়ে ১৪ই অক্টোবর আওয়ামী লীগ, ন্যাপ ও কমিউনিস্ট পার্টির সমন্বয়ে ত্রিদলীয় ঐক্যজোট গঠিত হয়। দেশে প্রগতি-প্রতিক্রিয়ার সুস্পষ্ট অবস্থান চিহ্নিত হতে থাকে।

১৯৭৪ সালের ৪ঠা এপ্রিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মহসিন হলে ৭ জন ছাত্রের নির্মম হত্যার পর ছাত্র লীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক শফিউল আলম প্রধান সহ কয়েকজন অভিযুক্ত হয়। সংগ্রাম পরিষদ বা ছাত্র ইউনিয়নগতভাবে প্রধানের মুক্তি চাওয়ার প্রশ্নে ছাত্র লীগের সাথে বিতর্ক উপস্থিত হয়। ফলে ঐক্য অচল হয়ে যায়। কার্যত এরপর দুই সংগঠনের ঐক্য ভেঙ্গে পড়ে।

বিশ্ব যুব উৎসব

১৯৭৩ সালের ২৮শে জুলাই থেকে ৫ই আগস্ট পর্যন্ত বার্লিনে বিশ্ব যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ব যুব উৎসবের প্রাক্কালে জাতীয় প্রস্তুতি কমিটির উদ্যোগে 'সাম্রাজ্যবাদকে প্রতিহত করে সোনার বাংলা গড়ে তুলুন' এই বক্তব্যের আলোকে সপ্তাহব্যাপী জাতীয় উৎসব পালন করা হয়। বাংলাদেশ থেকে ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্র লীগ, যুব লীগ, অন্যান্য রাজনৈতিক দল সহ ৮৫ জন প্রতিনিধি যোগদান করে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বিশ্ব সংগ্রামের সাথে বাংলাদেশের বলিষ্ঠ যোগসূত্র প্রকাশ করা হয়।

চতুর্দ্দশ সম্মেলন

১৯৭৩ সালের ১১, ১২ ও ১৩ই নভেম্বর চতুর্দ্দশ জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। রেসকোর্স ময়দানে বিশাল আকৃতির এই সম্মেলন উদ্বোধন করতে এসে বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন, চিলির মার্কসবাদী প্রেসিডেন্ট আলেন্দের মতো মৃত্যুবরণ করতে হলেও তিনি সমাজ প্রগতির জন্য লড়াই করে যাবেন। সম্মেলনের রিপোর্টে বলা হয়, 'আমাদের প্রতি ছাত্র সমাজের ঢালাও সমর্থন ছিল নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি মিশ্রিত। ...ছাত্রসমাজ ও দেশবাসীর দৈনন্দিন জীবনে সংকট যতই বৃদ্ধি পেতে থাকে, দুর্নীতির প্রকোপ যতই প্রসারিত হতে শুরু করে এবং সরকারের বিরুদ্ধে ছাত্রদের মনে যতই প্রশ্ন উঠতে আরম্ভ করে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী ভাই বোনেরা ততই আমাদের সংগঠনের বিভিন্ন নীতি সম্পর্কে বিভ্রান্ত হতে শুরু করেন।' এই সম্মেলন গত সম্মেলনে গৃহীত দেশগড়ার জন্য নতুন ধারার সংগ্রামই অনুমোদন করে। সমাজতন্ত্রের বিপ্লবী সংগ্রাম গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলার জন্য এই সম্মেলনে আহ্বান জানানো হয়। সম্মেলন নুহ-উল-আলম লেনিনকে সভাপতি ও মাহবুব জামানকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচন করে।

সংকটের আবর্তে দেশ

১৯৭৪ সালের শুরু থেকেই দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, আইন শৃঙ্খলাসহ সামগ্রিক অবস্থার ক্রমাবনতি ঘটতে থাকে। দফায় দফায় মূল্য বৃদ্ধি, কালোবাজারী, মজুদদারী বল্গাহীনভাবে বাড়তে হতে থাকে। সরকার

দেশকে এগিয়ে নিতে, প্রগতির পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে অসমর্থ বলে প্রতিপন্ন হয়। ছাত্র ইউনিয়ন এমতাবস্থার পরিবর্তন দাবী করে। ২৫শে এপ্রিল জাতীয় পরিষদের সভায় ও ৬, ৭ জুলাই কেন্দ্রীয় কর্মী সমাবেশে সংকট মোকাবেলায় ছাত্র ইউনিয়নের অভিমত তুলে ধরা হয়। ছাত্র ইউনিয়ন দাবী করে দুষ্কৃতিকারী যেই হোক—যা-ই তার রাজনৈতিক পরিচয় হোক, শাস্তি তাকে পেতেই হবে—সরকারকে কঠোর হতেই হবে। দেশের স্বার্থে—জনতার স্বার্থে ছাত্র সমাজকে বিশেষতঃ ছাত্র ইউনিয়নকে দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

বন্যা—দুর্ভিক্ষ

এই সময়ে দেশের বুকে নেমে আসে প্রলয়ংকারী বন্যা, ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। লাখ লাখ মানুষকে বাঁচানোর আহ্বান নিয়ে ছাত্র ইউনিয়ন ঝাঁপিয়ে পড়ে গোটা বাংলাদেশে। এখন তৎপরতা, চিকিৎসা ইত্যাদির পাশাপাশি চাষী-দের বিনামূল্যে বীজ সরবরাহের জন্য শত শত বীজতলা করা হয়। ডাকসুও এ ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করে। দুর্ভিক্ষ মোকাবেলার জন্য রুটি, অর্থ ও অন্যান্য সাহায্য সামগ্রী সংগ্রহ করে এলাকায় এলাকায় সরবরাহ করা হয়। বহু লঙ্গরখানা খোলা হয় এবং বিভিন্ন লঙ্গরখানায় ছাত্র ইউনিয়ন কর্মীরা স্বেচ্ছামূলক কাজ করে। সুখে-দুঃখে সব সময় ছাত্র ইউনিয়ন জাতির পাশে থাকবে—এই নীতি বাস্তবায়নের সংগ্রামে ছাত্র ইউনিয়ন সারা দেশে সাধ্য অনুযায়ী কাজ করে যায়। তবে অন্যান্য সংগঠন এ ধরনের কাজে অংশ না করায় ছাত্র সমাজের সামগ্রিক অংশগ্রহণ এক্ষেত্রে সম্ভবপর হয়নি।

পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে

দেশের 'সংকট মোকাবেলার' জন্য সরকার ২৮শে ডিসেম্বর জরুরী আস্থা ঘোষণা করে। ১৯৭৫ সালের ২৫শে জানুয়ারী পার্লামেন্টে চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার চালু হয় এবং ২৪শে ফেব্রুয়ারী এক-দলীয় পদ্ধতি-বাকশাল গঠন করা হয়। সব সংগঠনের কাজ এ অবস্থায় বন্ধ হয়ে গেলে সঙ্গত কারণে ছাত্র ইউনিয়নের সাংগঠনিক কাজও এ সময়ে বন্ধ হয়ে যায়।

পাঁচ

সংগ্রামের প্রশস্ত পথ

গ্রেফতার নির্যাতন

'৭৫ সালে মোশতাকের ক্ষমতা দখলের পর থেকে দেশপ্রেমিকদের উপর গ্রেফতার-নির্যাতন নেমে আসে পাইকারী হারে। ছাত্র ইউনিয়নের অনেক নেতা, কর্মীও গ্রেফতার হয়। এই সময়ে ছাত্র ইউনিয়ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে স্বাধীনতার মূল্যবোধের উপর দেয়াল লেখা, পোস্টারিং করা হবে এবং বঙ্গবন্ধুর হত্যার প্রতিবাদে মিছিল করা হবে। হত্যাকাণ্ডের পর অল্প সময়ের মধ্যেই এ কাজগুলো করা হয়। ৪ঠা নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডাকসু ও ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে মিছিল বের হয়ে বঙ্গবন্ধুর বাড়ি পর্যন্ত যায়। ছাত্র লীগসহ অন্যান্য অনেকেই এতে যোগ দেয়। বঙ্গবন্ধুর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশে আয়োজিত এ মিছিলে অসংখ্য ছাত্র ও রাজনৈতিক নেতা অংশ গ্রহণ করে। ছাত্র লীগের যে সব নেতা কর্মীকে পাওয়া যায় তাদের সাথে যোগাযোগ কারও কাজে নামানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়। প্রচার পত্র ছাপানো হয়। ইস্পাত নামে একটি গোপন পত্রিকাও প্রকাশ করা হয় এবং বিভিন্ন জেলায় পাঠানো হয়।

গ্রেফতার, নির্যাতন, মিথ্যা মামলার বিরুদ্ধে ছাত্র ইউনিয়ন প্রতিরোধ দাঁড় করাতে চেষ্টা করে। এই সময়ে ছাত্র ইউনিয়নের এক কালীন সভাপতি ও ডাকসুর সহ-সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম সহ অনেকেই কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক ও ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক মাহবুব জামানকে মিথ্যা মামলায় কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এ ধরনের মিথ্যা মামলার শিকার অনেকে হন। তবুও ছাত্র ইউনিয়ন কর্মীরা পিছ পা হয় না। নতুন কর্মসূচী নিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হয়।

সাংগঠনিক তৎপরতা

১৯৭৬ সালের ২২ ও ২৩শে অক্টোবর জহুরুল হক হলে ছাত্র ইউনিয়নের জাতীয় পরিষদের বর্ধিত সভা আহ্বান করা হয়। দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর সংগঠনকে পুনরুজ্জীবিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কাজী আকরাম হোসেনকে কার্যকরী সাধারণ সম্পাদক নির্বাচন করে সম্মেলনের লক্ষ্যে কাজ চলতে থাকে। ২৩শে অক্টোবর সম্মেলন প্রস্তুতি পরিষদ ঘোষিত হয়। জহুরুল হক হলেই কেন্দ্রীয় যোগাযোগ স্থাপিত হয়। পরে ৮ নং বক্সী বাজার লেনে একটি ভাঙ্গা ঘর ভাড়া নিয়ে কেন্দ্রীয় অফিস চালু করা হয়। কাজ কর্মের কোন পয়সা নেই—সম্মেলন হবে কি করে—চাঁদা উঠাতে গেলে ধরে। তাতে কি? কর্মীরা এক বেলা না খেয়ে টাকা দিলেন, সম্মেলনের প্রাথমিক কাজ শুরু হলো।

পঞ্চদশ সম্মেলন

২৭ ও ২৮শে নভেম্বর শায়েস্তা খান কল্যাণ কেন্দ্রের মতো ক্ষুদ্র একটি হলে সম্মেলন হয়। ত্রয়োদশ, চতুর্দ্দশ সম্মেলনের বিশাল জমায়েতের তুলনায় এ যেন এক 'বিন্দুবৎ' ব্যাপার। এবারও প্রতিনিধিরা বেশ উৎসাহ নিয়েই সম্মেলনের কাজে অংশ গ্রহন করেন।

'ছাত্র সমাজ ও দেশবাসীর স্বার্থই আমাদের কাছে প্রথম ও শেষ কথা' রিপোর্টের এ বক্তব্য ভিত্তি করে সম্মেলনে ঘোষণা করা হয়, 'একদিকে ন্যায়ের জন্য গঠনমূলক ভূমিকা, অন্যদিকে অন্যায় অসত্যের বিরুদ্ধে গর্জে উঠা'—এই হচ্ছে ছাত্র ইউনিয়নের মূল রণধ্বনি।

ছাত্র সমাজের শিক্ষার দাবী বাস্তবায়ন, স্বাধীনতা বিরোধী চক্রান্ত প্রতিহত করা, গণতান্ত্রিক পরিবেশ প্রতিষ্ঠা করা, সমাজ প্রগতি বিরোধী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ দাঁড় করানোর প্রস্তাব পঞ্চদশ সম্মেলনে গৃহীত হয়। এ লক্ষ্যে সংগঠনকে গুছিয়ে নেয়ার পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হয়। সম্মেলনে কাজী আকরাম হোসেনকে সভাপতি ও কামরুল আহসান খানকে সাধারণ সম্পাদক করে নতুন কমিটি নির্বাচন করা হয়।

ব্রহ্মপুত্র নদ খনন

সম্মেলনের পর পর ছাত্র ইউনিয়ন নিজ সংগঠনকে সংহত করার পাশাপাশি একটি গঠনমূলক কাজে হাত দেয়। ব্রহ্মপুত্রের ভাঙ্গনে শম্ভুগঞ্জ সেতু ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হুমকীর সম্মুখীন হয়। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আহ্বানে ছাত্র ইউনিয়ন থেকে '৭৬ এর ডিসেম্বরের শেষ দিকে ১০০ জনের একটি টিম ভরাট নদী কাটতে যায়। পরবর্তীতে আরও একটি টিম সেখানে গিয়েছিল।

দু'টো অভিজ্ঞতা

পঞ্চদশ সম্মেলনের পর দুটি ঘটনা ঐক্যবদ্ধ ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রাথমিক সোপান হিসেবে কাজ করেছে। স্বাধীনতা বিরোধী আলবদর গোষ্ঠী—ইসলামী ছাত্র শিবির পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বেশ শিকড় গেড়ে নিতে সক্ষম হয়। তারা স্বাধীনতার স্মৃতিস্তম্ভ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থাপিত 'অপরাজেয় বাংলা'কে ভাঙ্গতে আসে। ছাত্র সমাজ ঐক্যবদ্ধভাবে স্বাধীনতা বিরোধীদের ঐ কাজ প্রতিহত করে। ১৯৭৭ সালে তৎকালীন সরকার নতুন পে স্কেল ঘোষণা করে। এই পে স্কেলকে কেন্দ্র করে মেডিক্যাল, ইঞ্জিনিয়ারিং, এগ্রিকালচার বিষয়ে পাঠরত ছাত্ররা আন্দোলনে নামে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে এ নিয়ে আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। এতে বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিই থাকে।

'৭৫ এর পর, প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতার পর, এই প্রথমবার এক প্ল্যাটফরমে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন সমবেত হলো। আওয়ামী লীগ পন্থী ছাত্র লীগ, জাসদপন্থী ছাত্র লীগ, ছাত্র ইউনিয়নসহ আরও অনেকে ঐক্যবদ্ধ হন। যদিও এই বিষয়ে সংগ্রাম বিশেষ এগুতে পারেনি কিংবা ঐক্যও দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। তবুও এ ঐক্যবদ্ধ সমাবেশের প্রভাব পরবর্তী আন্দোলনে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।

রজত জয়ন্তী

১৯৭৭ সালের ২৬শে এপ্রিল ছাত্র ইউনিয়নের ২৫ বছর পূর্ণ হয়। প্রতিকূল পরিবেশ সত্ত্বেও ইঞ্জিনিয়ার্স ইনষ্টিটিউটে রজত জয়ন্তীর অনুষ্ঠানে ব্যাপক সংখ্যক প্রাক্তন কর্মী সমর্থক উপস্থিত হন। এ উপলক্ষে গৌরবের সমাচার নামে ২৫ বছরের ঘটনা প্রবাহের উপর একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়। ছাত্র ইউনিয়নের সংগ্রামী ইতিহাসের উপর এটিই প্রথম গ্রন্থ।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন

১৯৭৮ সালে দেশে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন দেওয়া হয়। এই নির্বাচনে দেশপ্রেমিক গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল দলগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য ছাত্র ইউনিয়ন প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। ছাত্র লীগকেও এই পথে আনা হয়। শেষ পর্যন্ত জেনারেল ওসমানীকে সম্মিলিত বিরোধী জোটের প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করানো হয়। জেনারেল ওসমানী সেই নির্বাচনে জয়লাভ করতে না পারলেও গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল ও ছাত্র সংগঠনগুলির মধ্যে একযোগে কাজকর্ম করার মনোভাব সৃষ্টি হয়। এই নির্বাচনে অবশ্য জাসদ ও তাদের অনুসারী ছাত্র লীগ পরোক্ষভাবে জিয়াউর রহমানকেই সমর্থন করে। ইউপিপি, ভাসানী ন্যাপ সহ পিকিংপন্থী কিছু দল ও দক্ষিণ পন্থী দল-উপদল জিয়ার পক্ষাবলম্বন করে।

বিশ্ব যুব উৎসব

এ বছর জুলাই মাসে কিউবার রাজধানী হাভানায় বিশ্ব যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিকূল অবস্থার কারণে ১০ জন প্রতিনিধি পাঠানোর জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্র লীগ, ছাত্র সমিতি, যুব ইউনিয়নের প্রতিনিধিসহ কবি নির্মলেন্দু গুণ ও রাজনৈতিক নেতা রাশেদ খান মেননকে নিয়ে প্রতিনিধি দল গঠিত হয়। কিন্তু তৎকালীন সরকার বৈধ ভিসা, টিকেট থাকা সত্ত্বেও প্রচলিত নিয়ম লংঘন করে প্রতিনিধি দলকে বিমানবন্দরে আটকে রাখে ও যাওয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারী করে। অবশ্য জাতীয় প্রস্তুতি কমিটির উদ্যোগে জাতীয়ভাবে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার প্রাঙ্গণে প্রদর্শনী ও উৎসব অনুষ্ঠান হয়।

শিক্ষা আন্দোলন

১৯৭৯ সালে টেকস্ট বুক বোর্ডের বই সরবরাহ করতে বেশ বিলম্ব হয়। শিক্ষা বর্ষ শুরু হওয়ার তিন চার মাসের মধ্যেও ছাত্ররা বই পায় না, শিক্ষা জীবনে সংকট নেমে আসে। ছাত্র ইউনিয়নের পক্ষ থেকে কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়—স্কুলের ছাত্রদের জমায়েত করে বোর্ড অফিস ঘেরাও করা হয়। বইয়ের দাম কমানো ও শিক্ষাবর্ষের শুরুতে বই সরবরাহ করার জন্য ছাত্ররা দাবী উত্থাপন করে। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচলিত সনাতন পদ্ধতির স্থলে সেমিষ্টার পদ্ধতি চালু করা হয়। নতুন পদ্ধতিতে ছাত্রদের নিয়মিত পরীক্ষা দেওয়ার জন্য সারা বছরই ব্যবস্থা থাকতে হবে। কিন্তু হলে থাকার জন্য সকলের ব্যবস্থা হয়না, গ্রন্থাগারে পর্যাপ্ত বই নেই, সকলের আর্থিক স্বচ্ছলতা নেই। সেমিষ্টার পদ্ধতির এসব পূর্ব শর্ত পূরণ করার জন্যও ছাত্র ইউনিয়ন থেকে দাবী তোলা হয় এবং সীমিত পরিসরে হলেও আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। অন্য সংগঠনগুলোও পরবর্তীতে অনুরূপ দাবী উত্থাপন করে।

ষোড়শ সম্মেলন

১৯৮০ সালের ৭ ও ৮ই এপ্রিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ছাত্র ইউনিয়নের ষোড়শ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের কয়েকদিন আগে ১লা এপ্রিল ছাত্র ইউনিয়ন সভাপতি কাজী আকরাম হোসেন সহ অনেক প্রগতিশীল রাজনৈতিক নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই গ্রেপ্তারকৃতদের অন্যতম এককালীন ছাত্র ইউনিয়ন নেতা ও বর্তমানে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ ফরহাদের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহ মামলা দায়ের করা হয়।

সভাপতি সহ কয়েকজন গ্রেপ্তার, সাধারণ সম্পাদক কামরুল আহসান খান সহ কয়েকজনের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা সত্ত্বেও সম্মেলনে আশাতীত জমায়েত হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে গ্রেপ্তারকৃতদের মুক্তি দাবী করেন এবং ছাত্র

ইউনিয়নের সংগ্রামের সাথে সংহতি প্রকাশ করেন। পরবর্তীতে দেশে ও বিদেশের বিভিন্ন সংগঠনের দাবীর মুখে কাজী আকরাম মুক্তি লাভ করেন।

সম্মেলনে ঐক্যবদ্ধ ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে শক্তিশালী সংগঠন গড়ার কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। আবদুল মান্নান খান সভাপতি ও আনোয়ারুল হক সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ

ঐ বছর রমজানের ছুটিতে ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে আঞ্চলিক প্রশিক্ষণের কর্মসূচী নেওয়া হয়। রাজনৈতিকভাবে শিক্ষিত কর্মীবাহিনী ছাড়া সুশৃঙ্খল সংগঠন কিংবা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব নয়। তাই ছুটির অবসরকালীন সময়ে সারাদেশকে ৮টি জোনে ভাগ করে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ছাত্র ইউনিয়নের ইতিহাস, রাজনৈতিক বক্তব্য, সাংগঠনিক কাজ, সমাজতন্ত্র ইত্যাদি বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এ বছর ১ হাজারের বেশি কর্মী প্রশিক্ষণ পায়। পরবর্তীতে ১৯৮৩ ও ১৯৮৪ সালেও অনুরূপ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

সপ্তদশ সম্মেলন

সপ্তদশ জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় বিশাল জমায়েত নিয়ে। জানুয়ারী ৭, ৮-১৯৮২, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় স্মরণকালের বৃহত্তম ছাত্র-ছাত্রী জমায়েত। গত সম্মেলনের পর থেকে সংগঠনের যে সত্যিকার বিস্তৃতি ঘটেছে তার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয় এই সম্মেলন। সম্মেলনে খন্দকার ফারুক সভাপতি ও আনোয়ারুল হক সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। সম্মেলনে দেশীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে যে বন্ধা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তা থেকে উত্তরণের পথ সন্ধান করা হয়। এই অন্ধকুঠরী থেকে বের হওয়ার পথ হিসেবে দ্রুত জাতীয় জাগরণ সৃষ্টির লক্ষ্যে নতুন ধরনের ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার বিষয়ে সম্মেলনের রিপোর্টে বলা হয়,

'আগামী দিনের নতুন জাতীয় জাগরণে ছাত্র সমাজ ও ছাত্র আন্দোলন যেন একটি বলিষ্ঠ ও উপযুক্ত ভূমিকা পালন করতে পারে সেই লক্ষ্যে

আমাদের সংগঠনকে গড়ে তুলতে হবে।'

নতুন ধরনের আন্দোলনের স্বরূপ প্রসঙ্গে রিপোর্টে বলা হয়,

'শিক্ষা সমস্যা ও ছাত্র জীবনের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আমাদের সংগঠন আন্দোলন গড়ে তুলবে। একই সাথে দেশের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সমস্যার বিরুদ্ধে, দেশের গরীব মেহনতি মানুষের সমস্যা নিয়ে সংগ্রাম চালিয়ে যাবে।...এইভাবে আগামী দিনে আমাদের সংগঠন এক নতুন ধরনের সংগ্রাম গড়ে তুলবে।'

আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য সাংগঠনিক করণীয় হিসেবে বলা হয়,

'আমাদের সংগঠনকে অন্ততঃ দুটি শর্ত অবশ্যই অর্জন করতে হবে। প্রথমতঃ আমাদের সংগঠনের জমায়েত শক্তির বিপুল বৃদ্ধি। দ্বিতীয়তঃ শিক্ষা সমস্যা ও অন্যান্য সমস্যার বিরুদ্ধে তীব্র লড়াই সংগ্রামের জন্য উপযুক্ত সাংগঠনিক ক্ষমতা। জমায়েত শক্তি আন্দোলন সংগ্রাম গড়ে তুলতে সাহায্য করবে—আবার আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সংগঠনের জমায়েত শক্তি বাড়বে।...আমাদের সংগঠনের পরিচয় হবে ছাত্র আন্দোলনের সংগঠন।'

ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের উদ্যোগ

যে আশাবাদ নিয়ে সম্মেলন সমাপ্ত হয় স্বল্পকালের মধ্যেই ছাত্র ইউনিয়ন তার বিপ্লবী ছাপ রাখতে সক্ষম হয়। সম্মেলনের পর ডাকসু নির্বাচন, এরপর একুশে ফেব্রুয়ারী। এসবের পর ছাত্র ইউনিয়ন নিজ সংগঠন বৃদ্ধির পাশাপাশি ঐক্যবদ্ধ ছাত্র আন্দোলন গড়ে তুলতে প্রয়াসী হয়।

২৬শে মার্চ স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ছাত্র ইউনিয়ন, জাসদ অনুসারী ছাত্রলীগ, আওয়ামী লীগ অনুসারী ছাত্রলীগের একাংশ (ফজলু-চুন্নু গ্রুপ) সহ ৭টি ছাত্র সংগঠন ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচী গ্রহণ করে। সম্মেলনের পূর্ব থেকে ছাত্র ইউনিয়ন নতুন ধরনের ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য যে বক্তব্য প্রচার করে আসছে তার ফলশ্রুতিতেই এই ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ২৫শে মার্চ বায়তুল মোকাররমে জনসভা করার বিষয়

ঠিক হয় এবং একটি কর্মসূচীও প্রণীত হয়। কিন্তু ২৪শে মার্চ সামরিক আইন জারী হয়ে যাওয়ায় কর্মসূচী স্বাভাবিক কারণেই স্থগিত হয়ে যায়।

১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮২

সামরিক আইনের কঠিন শৃঙ্খলের মধ্যে ১৭ই সেপ্টেম্বর ঐতিহাসিক শিক্ষা দিবস উদ্‌যাপনের জন্য ১৪টি ছাত্র সংগঠন এক হয়। এরশাদ সরকারের পুলিশ অতীতের সব ট্র্যাডিশন ভঙ্গ করে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় প্রবেশ করে এবং ১৬ই সেপ্টেম্বর মৌন মিছিল করতেও বাঁধা দেয়। ঐদিনের কর্মসূচী পুরো সফল করতে না পারলেও ভবিষ্যৎ আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ১৬ই সেপ্টেম্বরের ঐক্যবদ্ধ মৌন মিছিল যথেষ্ট অবদান রাখে। সাধারণ ছাত্রদের সমর্থনের কথা প্রকাশ পায় ঐ দিন। এরপর ৮ই নভেম্বর জাসদ ছাত্র লীগের মিছিলে পুলিশী হামলার জবাবে ছাত্র সমাজ গড়ে তোলে জঙ্গী প্রতিরোধ।

নতুন শিক্ষানীতি

বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ভবিষ্যৎ আন্দোলন প্রশ্নে গোপনে বৈঠক করতে থাকেন। কি কর্মসূচী—কি দাবী—কি পথে ইত্যাদি প্রশ্নে দীর্ঘ আলাপ আলোচনা চলতে থাকে। এর মধ্যেই সরকারের শিক্ষামন্ত্রী ডঃ আবদুল মজিদ খান শিক্ষানীতির রূপরেখা ঘোষণা করেন। প্রথম শ্রেণী থেকে বাংলার সাথে আরবী ও দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে ইংরেজী অর্থাৎ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তিনটি ভাষা বাধ্যতামূলক করা হয়। এ ছাড়া দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পড়ার পর সার্টিফিকেট পাওয়ার ব্যবস্থা—অর্থাৎ এস.এস.সি. পরীক্ষা তুলে দিয়ে একবারে এইচ.এস.সি পরীক্ষা দেওয়ার বিধান হয়। নবম, দশম শ্রেণীতে এক কোর্স প্রবর্তন। বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্বশাসন খর্ব করা, যারা শতকরা ৫০ ভাগ উচ্চ শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করতে সক্ষম রেজাল্ট খারাপ হলেও তাদেরকে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ দেওয়া এগুলিই হচ্ছে নতুন শিক্ষা প্রস্তাবের মর্মকথা।

উল্লেখিত গণবিরোধী বিষয়সমূহকে চিহ্নিত করে শিক্ষা বিষয়ে ছাত্র

আন্দোলন শুরু করার বিষয়ে ছাত্র সংগঠনগুলো একমত হয়। পত্রিকায় বিবৃতি পাঠানো হয়। শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের তরফ থেকেও প্রতিবাদ ধ্বনিত হতে থাকে।

তারপর ? তারপর কি করা এই নিয়ে কথাবার্তা চলতে থাকে। ছাত্র ইউনিয়নের পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্ট কতগুলো বক্তব্য রাখা হয়। আন্দোলনকে অভীষ্ট লক্ষ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য এ প্রস্তাবগুলো বিশেষভাবে বিবেচনার দাবীদার। স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের যোগাযোগের বাইরে অবস্থান করছে। তাই প্রথমতঃ এদের সাথে যোগসূত্র স্থাপন করা দরকার, এর জন্য শিক্ষাবিষয়ক দাবীনামা রচনা করে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করা হচ্ছে প্রাথমিক কাজ। দ্বিতীয়তঃ এসব দাবীর উপর ভিত্তি করে প্রচারপত্র, পোস্টার, ছাত্র সভা ইত্যাদি দিয়ে পরিস্থিতিকে পরিপক্ক করে তুলতে হবে। তৃতীয়তঃ পরিস্থিতি কিছুটা পরিপক্ক হলে দাবী দিবস, প্রতিবাদ দিবস, ছাত্র ধর্মঘট ইত্যাদি কর্মসূচী আহ্বান করা। উল্লিখিত কর্মসূচী পালন করতে করতে ছাত্র সমাজ আন্দোলনে কিছুটা অভিজ্ঞতা অর্জন করবে। এই সময়ে সামরিক আইন উচ্ছেদের জন্য রাজনৈতিক দলসমূহ ও অন্যান্য গণসংগঠন তাদের দাবী দাওয়ার ভিত্তিতে আন্দোলন শুরু করলে একযোগে রাজপথে ছাত্র-জনতার সংগ্রাম শুরু করা এবং অভীষ্ট লক্ষ্যে অগ্রসর হওয়া যাবে। ছাত্র ইউনিয়ন এভাবে আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্টভাবে প্রথম কাজটি করার অর্থাৎ গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করার প্রস্তাব করে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, সেদিন অনেকেই এ কাজটির মধ্যে কোন আন্দোলন দেখতে পাননি—তাই একে 'অবিপ্লবী' বলে দূরে ঠেলতে চেয়েছেন। ছাত্র ইউনিয়ন অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে দেশব্যাপী এ কাজটিকে পরিচালনা করে। এর ফলে সাধারণ ছাত্রদের সাথে আন্দোলনের যোগসূত্র রচিত হয় যা পরবর্তীকালে খুবই কার্যকরী ফল বয়ে আনে।

১৪ই ফেব্রুয়ারী

১৪ই ফেব্রুয়ারী স্মরণকালের বৃহত্তম মিছিল সচিবালয়ের দিকে যায়।

হাইকোর্টের মোড়ে টিয়ারগ্যাস, লাঠিচার্জ, গুলি চলে। জয়নাল, মোজাম্মেল সহ বেশ কজন শহীদ হন। বিকেলে শোক মিছিলের প্রস্তুতিকালে ইতিহাসের বর্বরতম পুলিশী নির্যাতন হয় বটতলায়, কলা ভবনে। কয়েক হাজার ছাত্রকে গ্রেফতার করে জঘন্য কায়দায় নির্যাতন করা হয়। ছাত্রীরাও এ নির্যাতনের হাত থেকে রেহাই পায়নি। সন্ধ্যা ৬ টায় কারফিউ দিয়ে হলে চালানো হয় নির্যাতন। ১৫ তারিখ হরতাল আহবান করা হয়। ঢাকা ও চট্টগ্রামে শহীদ হন কয়েকজন। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করা হয়।

ছাত্র ইউনিয়ন থেকে ঐ দুঃসময়ে পরিকল্পনা নিয়ে আবার অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করা হয়। ৬ই মার্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শোক দিবস পালিত হয়। ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা দিবসে ঘোষিত হয় ঐতিহাসিক দশদফা কর্মসূচী।

রাজনৈতিক ঐক্য

ইতিমধ্যে রাজনৈতিক দলগুলোও কিছুটা গুছিয়ে নেয়। ১৫ দলীয় ও ৭ দলীয় ঐক্যজোট গঠিত হয় এবং সামরিক আইন প্রত্যাহার, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি সহ ৫ দফা দাবী উত্থাপিত হয়। শ্রমিক কর্মচারীরা আন্দোলনে নামে। ১৯৮৩-এর ১লা নভেম্বর পালিত হয় সফল হরতাল। ২৮শে নভেম্বর অবস্থান ধর্মঘটে গুলি হয়। শহীদ হন কয়েকজন। ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৪ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের মিছিলে ট্রাক উঠিয়ে দিয়ে হত্যা করা হয় সেলিম ও দেলোয়ারের মতো দুই সংগ্রামী যোদ্ধাকে। ১লা মার্চ আবার হরতাল। শহীদ হন প্রাক্তন ছাত্র ইউনিয়নের নেতা ও আদমজীর শ্রমিক নেতা তাজুল ইসলাম। অগণতান্ত্রিক উপজেলা নির্বাচন বাতিল হয়। ২৭শে আগস্ট হয় আবার হরতাল। ২৭শে সেপ্টেম্বর পূর্ণ দিবস হরতাল ও ১৪ই অক্টোবর অনুষ্ঠিত হয় লাখ লাখ মানুষের জাতীয় সমাবেশ। সরকার বাধ্য হচ্ছে নতি স্বীকার করতে। রাজনৈতিক অধিকার স্বীকার করা হয়। নির্বাচনের কথা অস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। শ্রমিক কর্মচারীদের দাবী ও মানতে বাধ্য হচ্ছে এই সরকার। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার এই সংগ্রাম এখনও চলছে।

এই সময় ছাত্র ইউনিয়ন সভাপতি সহ অসংখ্য কর্মী বহুবার নিক্ষিপ্ত হয়েছে কারাগারে। অসংখ্য কর্মী হয়েছে নির্যাতিত। চট্টগ্রামে স্বাধীনতা

বিরোধীদের হাতে নিহত হয়েছে শাহাদাত হোসেন। তবুও উদ্ধত মাথা নোয়াবার নয়। সংগ্রাম চলছে, চলবে। সপ্তদশ সম্মেলনে যে ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল, 'আমাদের সংগঠন হচ্ছে আন্দোলনের সংগঠন'—তা আরেকবার বাস্তবে প্রমাণিত হলো সাম্প্রতিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে।

অষ্টাদশ সম্মেলন

ছাত্র জনতার আন্দোলনের পটভূমিতে ২১ ও ২২শে অক্টোবর, ১৯৮৪ অষ্টাদশ জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠানের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। সম্মেলনের পটভূমি বর্ণনা করতে গিয়ে প্রচারপত্রে বলা হয়, 'গত দুই বছর ধরে আমরা লড়াই করছি সামরিক স্বৈরাচার সহ সকল প্রকার স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, দেশীয় লুটেরা ধনীদের বিরুদ্ধে, গণবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল শিক্ষানীতি সহ ঘুণে ধরা গোটা সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে।'

আন্দোলনে ছাত্র ইউনিয়নের সংগ্রামী ভূমিকার জন্য এই সময়ে ছাত্র সমাজ ব্যাপকভাবে ছাত্র ইউনিয়ন সংগঠনের দিকে আকৃষ্ট হয়। জেলায় জেলায় সংগঠন নতুন প্রাণচাঞ্চল্যে মুখরিত হয়। একটি বৃহৎ সংগঠনে পরিণত হওয়ার লক্ষণ সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। এই ব্যাপক ছাত্র-ছাত্রীকে নিয়ে ভবিষ্যতে নতুন সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার অঙ্গীকার করতে গিয়ে সম্মেলনের প্রচারপত্রে বলা হয়, 'আজ আপোষহীন সংগ্রামের ঢল নেমেছে রাজপথে। এ সংগ্রামের ধারায় স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের আকাংখা বাস্তবায়নে ও সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে নবতর জাতীয় জাগরণ সৃষ্টি করতে হবে। এই সংগ্রামের জোয়ারকে চূড়ান্ত বিজয়ের পথে নিয়ে যেতে হবে। জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার আদায় করতেই হবে। সাম্রাজ্যবাদ ও তার বশংবদ আমলা-মুৎসুদ্দী ও প্রতিক্রিয়ার স্বার্থরক্ষাকারী সামরিক শাসনকে উচ্ছেদ করে স্বাধীনতার ধারায় অর্জিত বিজয়গুলো আবার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। জনগণের ভাত-কাপড়-শিক্ষা তথা সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার স্বপ্নসাধ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিপ্লবী সংগ্রাম অব্যাহত রাখার ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দুনিয়াজুড়ে সংগ্রামরত শান্তি, স্বাধীনতা ও মুক্তির মিছিলের পক্ষে দৃপ্ত শপথ উচ্চারিত হবে জাতীয় সম্মেলনে।'